মহাপ্রাচীর

স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য সেতু বন্ধন

মে-আগস্ট'২০

অনুভূতি

Unforgettable One Week in Bangladesh

করোনাভাইরাস এবং একটি চাইনিজ পরিবার
স্কলারশিপ এজেন্সিঃ প্রতারক হতে সতর্কতাসমূহ
মেঘের রাজ্যে বসন্ত

BCYSA নতুন কার্যনির্বাহী (বোর্ড-২০২০-২১

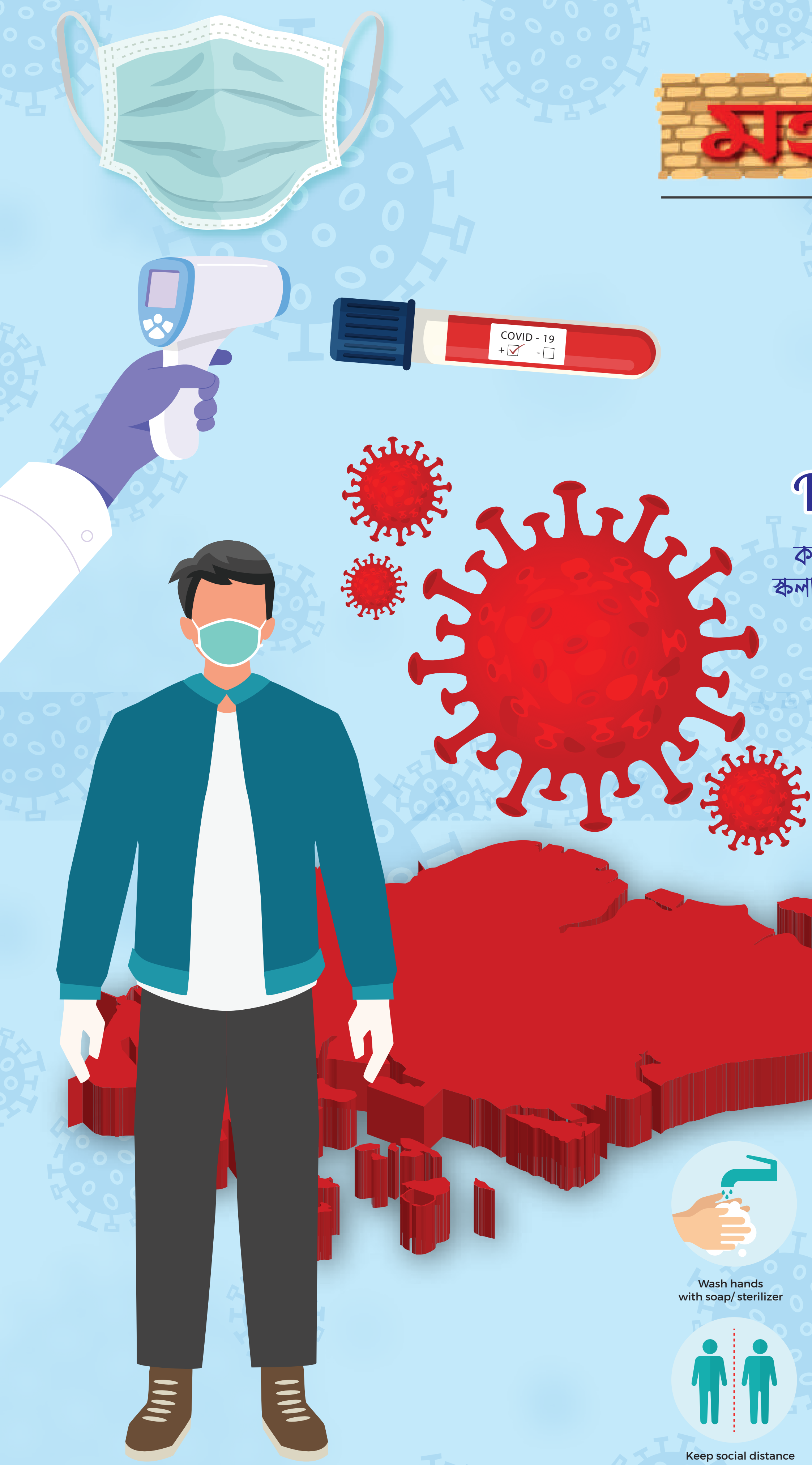

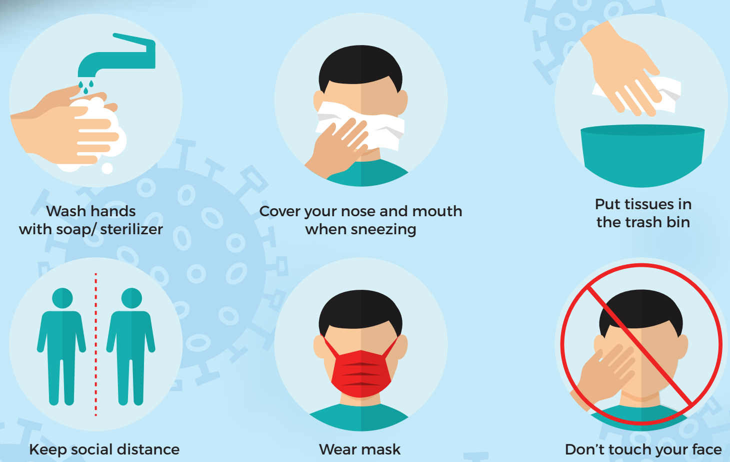

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক	:	মোঃ বশীর উদ্দীন খান
সহকারী সম্পাদক	:	মারুফ হাসান নাসিম নুজহাত ফারহানা
সম্পাদনা সহকারী	:	ইফতে খাইরুল হক ইমন ড. এম শাহানুল ইসলাম মোহাম্মদ ছাইয়েদুল ইসলাম গাজী তৌফিক এজাজ মোঃ নাজমুস সাকিব খান
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	মোঃ সাহাবুল হক মোহাম্মদ তৌহিদ এ. এ. এম মুজাহিদ
গ্রাফিক্স ডিজাইনার	:	হাছান আহম্মেদ

প্রকাশনা ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষণ

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

www.bcysa.org

www.facebook.com/bcysa2018

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সূচীপত্র

১. অনুভূতি
২. করোনাভাইরাস প্রতিরোধের উপায়
৩. যুগের স্বীকারোক্তি-আমরা মানুষ ছিলাম!
৪. Unforgettable One Week in Bangladesh
৫. করোনাভাইরাস এবং একটি চাইনিজ পরিবার
৬. স্কলারশিপ এজেন্সিঃ প্রতারক হতে সতর্কতাসমূহ
৭. Covid-19: Co-operate with each other
৮. দ্যা আর্ট অফ এভিয়েশন
৯. চীনদেশের প্রমোদ-উদ্যান
১০. মেঘের রাজ্যে বসন্ত
১১. বান্দরবানে বৈসাবী উদযাপন
১২. চীনের নিংশিয়া মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের করোনার দিনগুলি
১৩. চীনা ভাষার মাত্রা বিভ্রাট
১৪. চীনের অভিজ্ঞতা
১৫. প্রথম চীনে আসার অভিজ্ঞতা
১৬. পাহাড়ি অরণ্যে
১৭. কবিতা
১৮. চাইনিজ চিলি চিকেন
১৯. ঐতিহ্যবাহী যোং যি পিঠা
২০. চীনের হাত ধরে চলছে সার্কের মধ্যে প্রথম কোনো দেশের নদী তলদেশে টানেল নির্মাণকাজ
২১. সংবাদ
২২. BCYSA নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড-২০২০-২১
২৩. ফটোগ্রাফি

সম্পাদকীয়

২০১৬ সালে একঝাঁক মেধাবী তরুণ এবং স্বপ্নবাজ মানুষের হাত ধরে বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রা শুরু হয়। ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক ও অন্যান্য প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে এক অনন্য সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু হয় এ প্রতিষ্ঠানটির। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক এই প্রতিষ্ঠান তখন থেকেই জ্ঞান ও গবেষণানির্ভর সমাজ কাঠামো গঠন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের দৃঢ় প্রত্যয় লালন করে এক দল প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ সদস্যদেরকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সংগঠনটির দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন "মহাপ্রাচীর" নামক এই অনলাইন ম্যাগাজিনটি। ইতিমধ্যে এই ম্যাগাজিনের দু'টি সংখ্যা সফলভাবে প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠক ও সুধী মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। ম্যাগাজিন প্রকাশের পাশাপাশি অতি সম্প্রতি সংগঠনটি 'বিসিওয়াইএসএ নিউজ' নামে একটি নিউজ পোর্টালও উন্মুক্ত করেছে। এই নিউজ পোর্টালটি বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং সংবাদ প্রকাশ করছে। নিকট ভবিষ্যতে এ পোর্টাল থেকে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংবাদ প্রতিনিধি নির্বাচনের কাজও দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে করোনাভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারি যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তাতে নিঃসন্দেহে বর্তমান পৃথিবী এক ভয়াবহ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এতে বৈশ্বিক ভারসাম্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। গোটা পৃথিবী আজ গৃহ-অন্তরীণ হবার মাধ্যমে যেন প্রকৃতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে। এরকম কঠিন সময়েও বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় অনলাইন ম্যাগাজিন "মহাপ্রাচীর" এর তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এরকম একটি অসাধারণ উদ্যোগে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারাটা আমার জন্য বরাবরের মতোই অত্যন্ত সম্মানের। করোনাভাইরাসের নতুন প্রকরণ কর্তৃক মানব ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ এই বিপর্যয়ের সময়েও আমরা আমাদের ম্যাগাজিন বের করার চেষ্টায় যাদের পাশে পেয়েছি তাদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিকূল এই সময়ে ম্যাগাজিনটি জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে আসার পেছনে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যদের অব্যাহত ও জোরালো ভূমিকার কারণেই সফলভাবে এ সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

ম্যাগাজিনের এ সংখ্যায়ও সম্মানিত লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সাড়া আমাদের অভিভূত করেছে। সম্পাদকীয় নীতিমালা অনুসরণ ও কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে এবারও অনেকের লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশ না করতে পারায় সম্মানিত পাঠকদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। লেখা সংগ্রহ থেকে শুরু করে সংকলন ও সম্পাদনা অনেক দুরূহ ও জটিল ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া সংগঠনের সভাপতি ও উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণসহ সবাই এই ম্যাগাজিন বের করতে তাদের সময়, শ্রম, মেধা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাদের সবার প্রতি আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করছি। ম্যাগাজিনটি নির্ভুলভাবে প্রকাশে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এতে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ বিষয়ে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের যেকোনো পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

করোনা পরবর্তী আমাদের এ পৃথিবী ফিরে পাক তার স্বাভাবিক গতি, মানুষের জীবন হয়ে উঠুক আরো আলোকিত, মানবতার জয়গান গেয়ে পরাশক্তিগুলো কল্যাণকামী হয়ে উঠুক, সাম্যের সুর বেজে উঠুক চারিদিকে - এই কামনা করে শেষ করছি।

জুলাই ১২, ২০২০
সাংহাই, চীন।

বিনীত
মোঃ বশীর উদ্দীন খান
সম্পাদক

অনুভূতি

অনুভূতি কথাটা খুব ছোট হতে পারে, কিন্তু মানেটা বিশাল এবং তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে অনুভূতি হলো হাসি, কান্না, সুখ ও দুঃখের বহিঃপ্রকাশ। এই অনুভূতির কারণে মানুষ মানুষের কাছাকাছি আসে, আবার দূরেও চলে যায়। আর যদি বাঙালির অনুভূতি হয়, তাহলে তো কথাই নেই! বাঙালির কথা বলতেই একটা গল্প মনে পড়ে গেলো। কেন এমন কথা আমি বললাম তার একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যাও নিচে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

একবার আমার এক স্যারের কাছে তার ল্যাবের এক বিদেশি বৈজ্ঞানিক বন্ধুর গল্প শুনেছিলাম। কাহিনীটা হলো এমন -
হঠাৎ সেই বন্ধু ঠিক বেলা ১০টার সময় শুনতে পান যে তার বাবা হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন। তিনি ঐ সময় ল্যাবের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কথাটি শুনে স্যার খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, ভাবলেন ছেলেটি বোধহয় এখনি সব ফেলে রেখে চলে যাবে। বাবা বলে কথা! কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয়! তিনি এমন দুঃসংবাদ শুনে একটুও বিচলিত হননি। স্যার বললেন যে, "তুমি বাড়ি যাবে না"? তিনি বললেন, "যাবো তো, আমার হাতের কাজটা শেষ করে"। স্যার বললেন, "উনি তো তোমার বাবা। তোমার খারাপ লাগছে না"? তিনি বলেছিলেন যে, মানুষ মারা যাবে, এটিই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। বরং এ নিয়ে বেশি চিন্তা করলে আমার নিজের কাজের ক্ষতি হবে। আমি তো বেঁচে আছি"। সুন্দর মতো আগের চেয়েও আরও শান্তভাবে তিনি সব কাজ করেছিলেন। তারপর সব কাজ শেষে বেলা ৩টার সময় স্যারকে সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে অনেকটাই স্বাভাবিকভাবে চলে গেলেন, গোধূলির কোনো এক বাসে চড়ে। এটাকে অনুভুতি বলে না, একে বলে দায়িত্ব পালন মাত্র।।

এবার একটি বাঙালি অনুভুতির গল্প বলি----

সেবার চায়নায় মাত্র এসেছি। আমি বরাবরের মতই খুব বাস্তববাদী এবং মননশীল মানুষ। আবেগটা ঠিক কোথাও তেমন ভাবে কাজ করেনা।
রাত তখন অনেক গভীর, এক বড় আপু দরজায় এসে কড়া নাড়ালেন। আমি ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলেছিলাম। আপুকে দেখে বললাম, "কী হয়েছে আপু"? বললেন, "দেখ তো, আমার বাসা থেকে একটা মেসেজ এসেছে, বলছে বাবা অসুস্থ! কাল বাসায় যেতে হবে। আমার তো সামনে পরীক্ষা, কীভাবে কী করবো বুঝতে পারছি না। আর কেউ তো বাসায় ফোনও তুলছে না"। আমার বুঝতে বাকি রইলো না যে কী হয়েছে! কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেলো। কী করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বলেই দিলাম, "আপু আপনার বাবা মনে হয় মারা গেছেন"। কারণ তার কিছুদিন আগে উনার বাবাকে আইসিইউ-তে রাখার কথা শুনেছিলাম। তাড়াতাড়ি এক বড় ভাইকে কল দিলাম এবং সব খুলে বললাম। ভাইয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম যে এত রাতে কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয়! আমাদের বাঙালি কমিউনিটির উইচ্যাট গ্রুপে পোস্ট দেওয়ার সাথে সাথে সবাই কেমন ছুটে এসেছিলেন। সেই গভীর রাতটা দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। প্লেনের টিকেট থেকে শুরু করে গাড়ি, প্রফেসরের কাছ থেকে ছুটি ম্যানেজ করা, সব কিছু যেন কেমন মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেলো! হ্যাঁ, আমরা সেই রাতে বিদেশের মাটিতে মিলাদও পড়েছিলাম আপুর বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে। সেদিন কোনো শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ছিলো না। সারারাত সবাই মিলে এয়ারপোর্টে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ রাতে যারা পাশে ছিলেন, সবাই তাদের ভালো মানুষটাকে বের করে এনেছিলেন।
এই তো কয়েকটি দিনের দুনিয়া, চোখের পলকে ফুরিয়ে যাবে। সেদিন ছোট-বড় এর কোন অহংকার ছিলো না, ছিলো না কোন অহমিকার লড়াই, শুধুই ছিলো অনুভূতি; বাঙালির অনুভূতি। আমার গল্পটাও সেদিনের সেই অনুভূতির নিদর্শন বহন করে। ঐ দিনের পর থেকে আমার আজও মনে হয় যে, বাঙালিরা শুধু দায়িত্বপ্রবণ নয়, সাথে তারা আবেগপ্রবণ ও অনুভূতিশীল মানুষ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের চেয়ে আমাদের ঐক্য খুব বেশি মজবুত। আমরা যে যেমনই হই না কেন, কারো বিপদে, কারো প্রয়োজনে আমরা সবাই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের এই ঝাঁপিয়ে পড়ার সত্তার কারনেই অন্য দেশের মানুষজন আমাদেরকে দেখে অল্পতেই মুগ্ধ হয়।
আমি গর্বিত আমি বাঙালি, আমি বাংলাদেশি।

শিরিন আক্তার
পিএইচডি গবেষক, চাইনিজ একাডেমি অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স
হাংচৌ, চচিয়াং, চীন

করোনাভাইরাস প্রতিরোধের উপায়

চীন থেকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। সংক্রমণের ব্যাপকতা ও প্রাণহানির কারণে ভাইরাসটি নিয়ে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকলেই করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব। ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশের পর সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিতে সর্বোচ্চ ১৪ দিন সময় নেয়। প্রথম লক্ষণ জ্বর থেকে শুরু। তারপর দেখা দেয় হাঁচি ও শুকনো কাশি। এক সপ্তাহের মধ্যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ফুসফুসে সংক্রমণ যত বাড়ে, শ্বাসকষ্টও তত বাড়তে থাকে। বুকে ব্যথা হতে পারে। ক্রমে শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে। তবে কাবু করে ফেলে নিউমোনিয়া। অনেকের ক্ষেত্রে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (সার্স) দেখা দেয়। তাছাড়া ভাইরাসটি পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিণামে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকার্যকর (প্রথমে কিডনি বিকল) হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

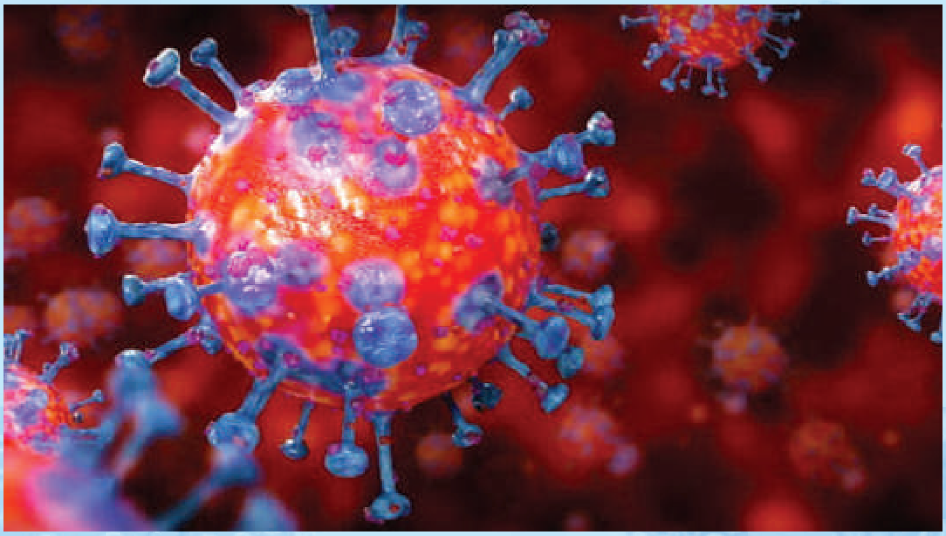

ছবিসূত্রঃ বিবিসি

করোনাভাইরাস প্রতিরোধের উপায় :

এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসের কার্যকরী কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি।
তবে সচেতন থাকলে ও কিছু নিয়ম মেনে চললে এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে অনেকাংশেই রেহাই পাওয়া সম্ভব।

* বাইরে বের হওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
* বাইরে থেকে ফিরে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।
* বাইরে পরা ময়লা কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলতে হবে।
* সর্দি-কাশি, জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি যাওয়া যাবে না।
* ফলের রস এবং পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।
* ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের যতটা সম্ভব গণপরিবহন এড়িয়ে চলতে হবে।
* কিছু খাওয়া কিংবা রান্না করার আগে হাত ভালো করে ধুতে হবে।
* অসুস্থ জীবজন্তু থেকে দূরে থাকতে হবে।
* কোনো পশু স্পর্শ করার পর ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।
* উচ্চ তাপমাত্রায় ও রোদে ভালোভাবে কাপড়, তোয়ালে, চাদর ইত্যাদি শুকিয়ে নিতে হবে।
* ডিম কিংবা মাংস রান্নার সময় ভালো করে সেদ্ধ করতে হবে।
* যারা অপুষ্টি, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ নেন এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

ডা. আরিফুল হক
এমডি অর্থোপেডিকস (অধ্যয়নরত)
খুনমিং মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
খুনমিং, ইউন্নান, চীন

Unforgettable One Week in Bangladesh

Hello, dear readers! My name is Duan Wei, a Chinese girl having a graduate education at Yunnan University. During the winter holiday in 2020, I had a good time with my dear friend Nuzhat Farhana along with her family and relatives in Bangladesh for one week. I sincerely thank her for accompanying me and creating gorgeous memories during my lifetime.Before introducing my one-week experience in Bangladesh, it is of necessity to introducethe actualsocial background, which I haveexactly experienced in China in recent years. In light of China's global influences of theeconomy economy and soft power projections, Chinese language has been promoted worldwide. Given the increasing prominence of China's Belt and Road Initiative, an increasing number of South Asian students come to China for learning Chinese. Starting from the year 2015, with the cooperative relations between China and Bangladesh, numerous Bangladeshi students have come to Yunnan University to receive higher education in China. It is in the context of social interactions that I have the chance to make friends with Bangladeshi students and get to know Bangladeshi culture. With the passion for seeing the world and enthusiasm to experience the socio-cultural life of Bangladesh in person, I landed in Dhaka, the capital of Bangladesh, and started to immerse myself in the colorful cultural life.

In the next paragraphs, I would like to write down the personal happy and relaxing experiences engaged with diversified cultural practices and warmth.

I was lucky enough to attend two Bangladeshi weddings over the past week. I was invited to the wedding of Nazim, 'Who is' unnecessary one of my best friends studying Chinese at Yunnan University. It was precious memory for me to enjoy the international friend's crucial moments with a different culture. At the wedding, Nazim was admired by the guests for his fluent Chinese. It was interesting that I was treated like a foreign star as some unknown little girls came to take photos with me.

I was invited to another wedding during my visit to the port city of Narayanganj. With the kindness and hospitality of Farhana and her family, I got the chance to appreciate the traditionally special wedding attire and immerse in a special cultural atmosphere.

A photo with Farhana and the brides

I was impressed by Bangladeshi arts and crafts in Bibi Productions, Aarong, and Jatra. The founder of Bibi Productions Shop, Bibi Russell as a female entrepreneur, is committed to preserving Bangladesh's heritage, empowering women, and eradicating poverty by collecting works of rural artisans and redesigning products in natural fabric. I fully appreciate her significant contribution to the Bangladeshi society.

I captured the happiness between the bride and bridegroom

A photo with Farhana and the bride

The fashion designing in Aarong also attracted me. When having a look at the silver earrings collection in Aarong, I could not move my body an inch! It was a joyful shopping experience for me to buy Aarong's cultural products. The Jatra shop gave me a sense of softness and ecological balance for designing cultural products with natural materials. Besides, the concept of promoting Bangladesh as the country of tigers is advocated by EMK center and artist Nazir Hossain. He depicts the Bengal Tiger as a remarkable asset of Bangladesh in his artworks through the representations of national animals with elements of different Bangla folk and mythology. I was lucky to meet him and enjoy his painting practiced in jute bags, jewelry, and accessories. The pictures of Bangladeshi arts are shown in the following four figures.

A selfie with Farhana at Jatra Biroti Café(Shirt bought from Bibi Productions and earring pairs from Aarong)

Crafts bought in Jatra (Handmade notebook and carrying bag designed by recycled materials and unique jewelry)

A photo with Nazir Hossain (behind are his painting in jute bags and pendants)

Domestic designing of Jatra (what a soft space with ecological designs associated with Bengali features!)

Regarding the language aspect of Bangladesh, although its multi-ethnic culture has created the diversity and complexity of languages, Bangla language remains as the official language under governmental legislation. In Bangladeshi history, the Bangla Language Movement is considered as a national pride for advocating it as a national symbol against the Urdu language under the Dominion of Pakistan. I admire the courage and power of Bangladeshi people to fight for linguistic rights. Now Bangla language is widely used in different fields of society. For me, without any linguistic knowledge of Bangla language, it was hard to communicate with the majority of people. In daily communication, except a few spoken expressions in Bangla such as "my name is.../how are you/I'm fine/ beautiful" I was just able to use body language to express myself in funny ways. As for foreign languages, English has permeated in government affairs and medium of education. Due to British colonization and continuous globalization, English is reshaped as a valuable language with dominant values in cross-cultural communications, job applications, and educational development. Living in Bangladesh sometimes, English saved me in talking to those who can understand English. As I mentioned in the beginning, under China's Belt and Road Initiative, the Chinese language has been promoted in South Asian countries. Chinese language now in Bangladesh has learned by many of Bangladeshi people in the Confucius Institutes at Dhaka University and North South University, as well as CRI classroom and Chinese language training schools. I expect to use Chinese to communicate with more Bangladeshi people in the future.

Homemade main dishes (Rice cakes, Rice with Lentil, Biriyani, fried Hilsa fish, Beef curry and spicy specialties)

Bangladeshi snacks and desserts (Fuchka, Chatpati Mishty, Vermicelli with milk, Milk tea)

Attracting items in Dhaka University ("accounting week 2020" written in balloon and ornamental designing of MBA building)

I visited Dhaka University, one of the best public universities for receiving higher education in Bangladesh. Walking on the campus, I could be easily influenced by the profound learning atmosphere. I've seen students gathering in small groups talking passionately with each other. Even though I could not understand what they were discussing, I could realize the warmth among them from students' friendly and active gestures. I could also identify their respect for knowledge and positive attitudes towards learning based on the hot discussions and careful studies holding books. Looking up inadvertently, the advertising balloon and remarkable designing of the academic building caught my eyes, as shown in the next figure.

When it comes to the cultural heritage, Panam city and Folk Art Museum attracted me for the historical charm and cultural exhibition.
Along the Brahmaputra River and Shitalakkha River, I could see many decorated boats and river-based lifestyles and rice factories. The landscapes were totally different from the noisy city, which aroused my heart's inner peace and calm.

Panam City

Beautifully cultural landscapes along with the rivers. The image of over-populated country with serious traffic jams and severe stratification made a deep impression on me when I first landed in here! Whenever I exposed myself to public streets, the streams of crowds, and vehicles took the initiative to occupy my sights. The sounds of car horns, rickshaw bells and CNG Auto-rickshaw horns kept buzzing and echoing in my brains. In such a densely-populated city, a feeling of nervousness and panic was evoked. I was also told to take care of my bags for the

frequent occurrences of snatching and stealing. It was hard to position myself walking down the street alone in the evenings, similar to the routine life in China. It is really a city that needs patience, tolerance and protection for both local citizens, and newcomers.

Some cultural exhibitions in the museum

In addition of, the impression about street scenes, I was informed of social stratification from visible observations in terms of various attributes such as property, gender ,and religious affiliation. There is no intention to write an academic paper about analyzing social facts in Bangladesh. However, I would like to mention more about the gender aspects. As a female, it is natural to notice the social roles of women in different societies. In Bangladesh, I noticed the lack of women's participation in the streets doing business. Bangladeshi women are arranged to be in charge of household affairs. Although women in modern times gradually have gained more social mobility and social roles beyond domestic sphere, men are still positioned as privileged and advantaged since they are allocated with greater access to education and employment, and more authority both at home and in social arena.

Beautifully cultural landscapes along the rivers

Although the above description is relatively negative, it is understandable for me because all the cities in the world experience transformation period and better changes will be constructed among different social groups. The perception to appreciate social and cultural differences on an equal basis should be advocated all over the world.

In the end, the colorful cultures of Bangladesh and the warmth of local people made my one-week experience unforgettable. Given the fact that it is impossible to understand one country and its culture in such a short period, what I have discovered and enjoyed has become a great treasure in my life. Someday in the future, I will go to Bangladesh again and I'm looking forward to experiencing more appealing cultural practices in different regions. And if you are interested in Chinese culture, welcome to China.

Author – Duan Wei
Master's Student, English, Yunnan University
Chenggong, Yunnan, China

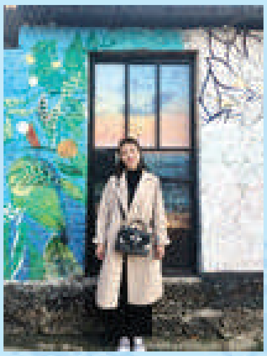

করোনাভাইরাস এবং একটি চাইনিজ পরিবার

চীনা বন্ধুর পরিবারের সাথে লেখক

যখন ভাইরাসটি প্রথম শুরু হয়, তখন আমাদের ভার্সিটি থেকে প্রায় ৩৫ কিঃমিঃ দূরে আরেক শহরে আমার এক চায়নিজ বন্ধু (পান লে)- র বাসায় ছিলাম। চায়নিজ নিউ ইয়ার উপলক্ষ্যে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করানোর উদ্দেশ্যে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়েছিল, আমি আমার জীবনে কোনোদিন হয়তো ভুলতে পারবো না।

আমার বন্ধুটি তার পরিবারের খুব আদরের ছিলেন, সেই সুবাদে হয়তো আমারও একটু লাভ হয়েছিল। তার আত্নীয়স্বজনদের কাছ থেকে ২৪০০ আরেমবি রেড প্যাকেট পেয়েছিলাম। যারা চায়নাতে থাকেন তারা রেড প্যাকেট সর্ম্পকে ভাল জানেন। রেড প্যাকেট হচ্ছে আমাদের দেশের ঈদের সালামি দেয়ার মতো।

আমি মুসলিম সেটা তারা জানতো, তাই যখন তাদের খাবারে শূকর রাখতো, তখন আমাকে আলাদা করে খাবার দেয়া হতো, যাতে আমার কোনো সমস্যা না হয়। সবকিছু ভালোই চলার কথা ছিল, কিন্তু সমস্যা বাঁধালো করোনাভাইরাস। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি যখন এটা বড় আকার ধারণ করে, তখন তার পরিবার থেকে সাথে ২৪ প্যাকেট গরুর দুধ সহ কিছু শুকনো খাবার দিয়ে আমাকে আমার ভার্সিটিতে রেখে যায়। দু'একদিন পরপর সে না হয় তার পরিবার থেকে খোঁজখবর নিতেন। বলেছিল, কোনো সমস্যা হলে যেন জানাই ।

সে কোন ধর্মে বিশ্বাসী না হলেও আমাকে বলেছিল, তুমি তোমার স্রষ্টার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো, সেই সাথে আমাদের প্রতিও। আর এখানে আমার পরিবারকে তুমি দ্বিতীয় পরিবার ভাবতে পারো। কখনো ভেবো না যে তুমি একা; তোমার পাশে আমরা সবাই আছি। এর পরেও যদি দেশে যেতে চাও, আমি তোমাকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো। তবে, আমার মনে হয় তুমি তোমার দেশের থেকে চায়নাতে ভালো থাকবে।

সুতরাং, সব কিছু আমার পরিবারের সাথে শেয়ার করার পর তারাও আর দেশে ফিরতে চাপ দেন নি । চায়নিজদের যোগানো সাহস আর ভার্সিটির ঠিকমতো কেয়ার নেওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলাম।

লেখক - মোঃ খাইরুল ইসলাম
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং (শেষ বর্ষ)
হুয়াইইন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
হুয়াই'আন, চিয়াংসু, চীন

স্কলারশিপ এজেন্সিঃ প্রতারক হতে সতর্কতাসমূহ

অনেকেই এমন আছেন যে, দেশ ছাড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, জীবনযাত্রার মান ও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক দিক বিবেচনা করে বিদেশে পড়তে যাবার জন্য অনেক বেশি আগ্রহী বা ভালো অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে-মেয়ে যারা বিদেশে পড়তে আসার জন্য ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা অনায়াসে খরচ করতে পারেন। আবার অনেকেই আছেন, যারা মধ্যবিত্ত কিন্তু মনে করেন এককালীন খরচে যদি একবার দেশের বাইরে যাওয়া যায় তবে তো.......ছক্কা।
তো, এ ধরনের লোকজন যাতে প্রতারণার শিকার না হন, সেজন্যই এই লেখনী-

১. প্রথমেই একটি এজেন্সির খোঁজ নিতে হবে। (ব্যাকগ্রাউন্ড)
২. কতজন স্টুডেন্ট এখন পর্যন্ত পাঠিয়েছেন তা জানার চেষ্টা করা ও সম্ভব হলে তাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলা যে, এরা কেমন সার্ভিস দেয়। (ফেসবুকের যুগে যা অনেকটাই সহজ)
৩. আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে বাঙালী আছে কিনা।
৪. সার্ভিস চার্জ অগ্রিম দেবার ব্যাপারে খুব সতর্কতা থাকতে হবে।
৫. অগ্রিম সার্ভিস চার্জ নিলে এডমিশন নোটিশ বা স্কলারশিপ না পেলে সার্ভিস চার্জ ফেরত দিবে কিনা
৬.স্কলারশিপ পাওয়ার পর কোন হিডেন বা লুকায়িত চার্জ আছে কিনা।
৭. থাকা ফ্রি কিনা।
৮. জীবন যাত্রার খরচ কেমন হবে।
৯. এজেন্সি কেমন চার্জ নেয়।
১০. অন্য এজেন্সিরা কেমন টাকা নেয়। তারা খুব বেশি নিচ্ছে কিনা নাকি সহনীয় মাত্রায় নিচ্ছেন। ঘুষের সহনশীলতার সূত্র অনুযায়ী সকল কাগজপত্র করতে কেমন খরচ হবে।
১১. যেখানে যাচ্ছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়টির রেপুটেশন কেমন তা গুগল করা।

পেছন তোমার, ধাক্কা খাওয়া হতে সামলাতে হবে তোমাকেই। তুমি যথেষ্ট ম্যাচিউর। সবকিছু বলে দেবার পরও যদি নিজের বেখেয়ালে ধরা খাও তাহলে তোমার দোষ। আর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকার পরেও ধাক্কা খেলে, সেটা তোমার নিয়তি। সব এজেন্সি খারাপ হয় না। নতুন নিয়মকানুন ও পরিবর্তন হয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

তাই, জীবন মানেই একটা যুদ্ধ। তা সামলাতে হবে তোমাকেই। সবকিছু খুব সহজে হয়ে গেলেকি হলো? কোনো এডভেঞ্চার হলো? কিছু শিখতে পারবে? আমরা বাঙালী মানুষগুলি আজবপ্রকৃতির।

দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার ক্ষেত্রে নিজে নিজে চেষ্টা করা শ্রেয়। অনেকেই সময়ের অভাব এবং তথ্য না জানার দুর্বলতায় বিভিন্ন কনসালটেন্সি সার্ভিস নিয়ে থাকেন, তাদের অগ্রিম সতর্কতার প্রয়াসে এই ক্ষুদ্র চেষ্টা।

লেখক - এম শাহানুল ইসলাম
থিয়েনচিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
থিয়েনচিন, চীন

Covid-19: Co-operate with Each Other

January 24, 2020. Chinese New Year's day, I heard the bad news regarding Corona virus, then known to the rest of the world as "Wuhan Virus". It made me very sad. However, many of my Chinese friends continued to send me Chinese New Year's wishes. I often wondered how these Chinese friends had to absorb days of bad news and exhibit such positive strength and energy. No one outside China could have imagined the level of difficulty and pain these brave Chinese friends had to endure. As a foreigner from Thailand, I was unable to empathize with their plight.

The world's attention and sympathy at that time were primarily focused on the Chinese people and China. We would hear bad news every day. For example, there were daily broadcasts of the number of infected cases each day, the number of deaths, and how many doctors had died, etc. With the daily barrage of bad news, we rarely heard reports of Chinese people going against the lockdown orders and decrees set forth by the legal authority. Besides, there were no protests witnessed in the streets. All lockdown instructions were politely carried out by all its citizens.

In the midst of such a continued string of bad news, we were pleasantly surprised to observe many positive acts of kindness shown by various groups of peoples from around the world. This truly represented the best mankind had to offer, just like the English saying that goes:

"A friend in need is a friend indeed."

To show solidarity with the Chinese people in China, some overseas Chinese even chartered an entire airplane to ship tons of masks to China. This was such a touching display of kindness and solidarity!

Solidarity in Chinese called '

⊠⊠' (Tuánjié)

⊠(Tuán)means group

⊠(jié) means knot

⊠⊠ means is bounded together into one group, we are friend, we are in the same boat and help each other forever .

After two month's, china was able to cope up with this epidemic successfully. with this epidemic. It now was able to manage and contain the number of newly infected Covid-19 cases. The world was not only stunned at its quick and absolute resolutionand containment to this problem. But it was even more shocked to witness how the Chinese people and their government were able to mutually and harmoniously cooperated to win this battle. The Chinese model has been so successful that many countries have now adopted the same or similar strategy to combat this problem.

China has been known to recently assist many troubled countries, including but not limited to, Italy, Iran and, a few others. The Chinese motto could easily have been said as, "Although we are not from the same country, we live in the SAME world.
Finally, regarding this dreadful disease, China is in solidarity with the rest of the world, and hopefully, it's vice versa.

"A friend in need is a friend indeed."

Thida Sutthangkhakun
Henan University of Technology
April 16, 2020

দ্যা আর্ট অফ এভিয়েশন

মাইন উদ্দিন

পাখির মতো এক পাখার মনোপেন নিয়ে শুরু হয় আমাদের যাত্রা, তারপর ক্রমে ক্রমে আধুনিক হতে থাকে আমাদের প্রযুক্তি, চিন্তাভাবনা। সভ্যতায় আসতে থাকে বাইপেন, ট্রাইপেন, পলিপেনসহ নতুন নতুন ডিজাইনের বিমান। সবার লক্ষ্য ছিলো সবচেয়ে স্বল্প খরচে, দ্রুতগতির ফলপ্রসূ, দূরপালার বিমান বানানো। প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি শব্দের বেগের দুই, তিন এমনকি পাঁচ গুণের ও বেশি গতি এবং নিরন্তর গবেষণা আমাদের এগিয়ে নিচ্ছে সাবসনিকের এই যুগ থেকে হাইপারসনিক যুগের বিপ্লবে।
যখন আকাশে দেখেন ছোট বা বড় আকৃতির বিমান, ছোট পাখা বা বিশাল বড় পাখার বিমান, লেজবিহীন কিংবা পাখা বিহীন অদ্ভুত বিমান, ডানাভাঙ্গা বা উপর নিচ বাঁক করা ডিজাইন, শরীর তীক্ষ্ণচোখা কিংবা ভোঁতা এমন বিমান, দানবাকৃতির মালবাহী বিমান কিংবা উভচর বিমান, প্রতিসম কিংবা অপ্রতিসম বিমান, হয়তো কখনো দেখে ফেলেছেন কোন উড়ন্ত সকার কিংবা হঠাৎ চোখ ঝলকিয়ে উধাও হয়ে যায় এমন বিমান। আরো কত রকমফের, কেন এতো বিচিত্রতা, কখনো আপনার কৌতুহল জেগেছে কিনা জানিনা। এ কি নিতান্তই স্বপ্নীল উন্মত্ত ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীদের আকাঙক্ষা নাকি প্রাকৃতিক নিয়ম কব্জা করে ওড়ার বিচিত্র কৌশল, যা অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিবে?
ঠিক তাই! বর্তমান গবেষণা আমাদের প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ করে ভবিষ্যতের যে রূপ দিচ্ছে তা সবারই গ্রাহ্য। এমন তিনটি সাম্প্রতিক গবেষণার কথাই এখন বলবো, যেগুলো বৈপবিক প্রযুক্তি হতে বেশি দেরি নেই।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীয়ক্ষয় নিরামক বস্তু- Self Healing Materials
বায়োমেটিক্স বিজ্ঞানের এমন এক শাখা যেখানে মানুষের জৈবনিক বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে প্রকৃতির কোন নকশা অনুকরণ করা হয়। এটা হয়ত সবার জানা, পীড়নের ফলে বিকৃতি হয় বা মেকানিক্যাল স্ট্রেসের ফলে ধাতুর ক্ষয় হয়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ নিজেদের গাঠনিক ক্ষয় রোধ করতে পারলেও ধাতুর (Fe,Sn,Cu,Ti,Mg) এ ধরনের ক্ষমতা নেই। তাই ক্ষয়রোধের বা নিরাময়ের কাজটা মানুষকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করতে হয়।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীয়ক্ষয় নিরামক বস্তু- Self Healing Materials

নমনীয় এবং দ্রুত অভিযোজনে সক্ষম বিমান- Morphing Aircraft

ধাতুর ক্ষয়গুলো সবসময় বড় হয়না, যার ফলে অতি আণুবীক্ষণিক ক্ষয়গুলো এক্সরে, আল্ট্রাসাউন্ড টেস্ট শনাক্ত করতে পারেনা, যা পরবর্তীতে বড় ফাটল বা ভাঙ্গনের জন্ম দিতে পারে, বিমানের ক্ষেত্রে অন্তত কেউ এটা আশা করবে না। ফলে আণুবীক্ষণিক Microscratch বা Microcrack সারাতে বিজ্ঞানীরা এই অভিনব অটোনোমিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন পলিমার, ইলাস্টোমার, ইপোক্সি, সিরামিক/পেইন্টস/কংক্রিট টাইলস/কম্পোজিট কোটিং করে থাকেন যার ভিতর আণুবীক্ষণিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে ক্যাপসুল আকারে (Microcapsule Agent) এই পলিমার সঞ্চিত রাখা হয়, যা পরবর্তীতে তাপমাত্রা বা অন্যান্য নিয়ামক এর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাপিত হয়ে ক্ষয়রোধ করে এবং ফাটল মিলিয়ে দেয়। মানব সভ্যতায় সর্বপ্রথম এধরনের সেল্ফ হিলিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে রোমান সভ্যতার স্থাপনাগুলো। তারা হয়ত নিজেদের অজান্তেই এক বিশেষ কংক্রিট ব্যবহার করতো, যার নিজস্ব ক্ষয়রোধী গুণ ছিলো এবং বিরূপ পরিবেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আজও টিকে আছে।

ভাবুন তো, এমন একটি বিমান যেটি উড়ন্ত অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছাড়াই চাহিদামতো গঠনগত পরিবর্তনে সক্ষম। NASA অনেক আগে থেকেই এমন Variable Geometry Aircraft তথা মরফিং এয়ারক্রাফট নিয়ে কাজ করছে এবং সম্প্রতি ভারতীয় এক বিজ্ঞানীর প্রতিষ্ঠান Flexsys এ গবেষণাকে আরো এগিয়ে নিয়েছে তাদের পরিবর্তনশীল বিমানের পাখা বা Morphing Wing এর প্রোটোটাইপ এর মাধ্যমে এবং এটি নাসার টেস্ট ফ্লাইটে সফলও হয়েছে। এ ধরণের পাখা আবহাওয়া ও অন্যান্য নিয়ামক অনুযায়ী সুবিধামত সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও উত্তম জ্যামিতিক গঠনে নিজের পাখার সম্মুখ, পশ্চাৎ, পার্শ্বও পরিবর্তন করতে পারে (Adaptive leading & trailing edge)। বিমানে এ ধরনের পাখা ব্যবহারের ব্যাপক সুবিধা রয়েছে, যেমন মরফিং পাখাতে কোনো আলাদা Flap, Aileron, Hinge, Gear ব্যবহার করা লাগবেনা, কারণ এ পাখা নিজস্ব সেন্সর ও অ্যাকচুয়েটর ব্যবহার করে গাঠনিক নমনীয়তার মাধ্যমে পাখাকে ভাঁজ বা উন্মুক্ত করে, সংকোচন বা প্রসারণ করে, সংযোগ বা বিয়োজন করে এরকম নানাবিধ উপায়ে বহুমুখী পরিস্থিতিতে লিফট, ড্রেগ, ম্যানুবার নিয়ন্ত্রণ করা যায় অথচ এই পাখা প্রচলিত পাখার চেয়ে বহুগুণ হালকা এবং এধরণের পাখা ব্যবহারের ফলে বিমানে জ্বালানির ব্যবহার ১২ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা যাবে।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, মরফিং পাখাও প্রকৃতির এক স্বচ্ছ অনুকরণ। প্রচলিত বিমানের পাখাগুলো পাখির ডানার মতো নমনীয় নয়, তাই পাখির মতো এমন নমনীয় পাখার বা অধিক গাঠনিক পরিবর্তনশীল বিমানের গবেষণা, যা Variable এবং Metry Aircraft বা Morphing Aircraft রূপে বর্তমানে প্রসিদ্ধ। শীঘ্রই হয়ত আমরা মরফিং এয়ারক্রাফটের যুগে প্রবেশ করবো।

জ্বালানিবিহীন বিমান - Zero Fuel Aircraft

জ্বালানিবিহীন বিমান নিয়ে গবেষণা খুব কমই বলা চলে, কারণ এধরণের বিমানের সীমাবদ্ধতা বেশ প্রত্যক্ষ। তবে সম্প্রতি পর্যন্ত এক গবেষণা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার এক নতুন দ্বার খুলে দিলো তাদের Ion Drive নামক Solid State Propulsion সিস্টেম এর মাধ্যমে। এ ধরণের প্রোফালশনে সাধারণ বিমানের মতো ঘূর্ণায়মান কোনো অংশ থাকবেনা (যেমনঃ টার্বাইন, প্রোপেলার)। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এ সিস্টেম চলবে কেবল আয়নিত বাতাসের প্রবাহ ব্যবহার করে। প্রচলিত বিমানের মতো এখানেও বিমানের পাখা থাকবে যার সম্মুখ (+,20kv) ও পশ্চাতে (-,20kv) ২০ হাজার ভোল্ট করে শক্তিশালী তড়িৎক্ষেত্র সৃষ্টি করা হবে এবং বাতাসকে আয়নিত করে (নাইট্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন সরিয়ে) যে প্রবাহ পাওয়া যাবে তা থেকে বিমান লিফট পাবে এবং উড্ডয়নে সক্ষম হবে। মজার ব্যাপার হলো, এ বিমান কোন শব্দ করে না, কারণ এখানে কোন টার্বাইন বা প্রোপেলার নেই, কেবল ইলেকট্রিক ব্যাটারিই ব্যবহার করা হয়।

লেখক - মাইন উদ্দিন জোবায়েদ
অ্যারোনটিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, শেনইয়াং অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি
শেনইয়াং, লিয়াওনিং, চীন

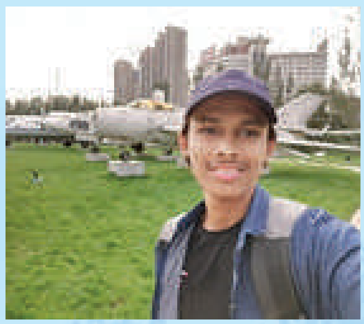

চীনদেশের প্রমোদ-উদ্যান

ছেলেবেলায় টেলিভিশান কিংবা পত্রপত্রিকায় দেখতাম একদল বুড়োমানুষ শুন্যে হাত তুলে, উপরের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসছেন! তখন খুব হাসতাম, ভাবতাম "জোর করে হাসার কী আছে? হাসলে আয়ু বাড়ে, তাই বলে অমন ভাঁড়ের মতন করে হাসতে হবে জোর করে?" হা হা! তখন কি আর বুঝতাম যে, স্বাস্থ্য ভালো রাখাকে কেন্দ্র করে একটা জাতির জীবনধারা বা সংস্কৃতি এত বিপুল আড়ম্বরে গড়ে উঠতে পারে? বলছি চীনদেশের উদ্যান সংস্কৃতির কথা! কী নেই তাদের প্রমোদ উদ্যানে? প্রথম প্রথম চীনে এসে লেক, পাহাড়, জঙ্গল যেখানেই যেতাম, সব ক'টাকেই আমার পার্ক বলে মনে হত। ধীরে ধীরে সমস্ত কার্যকলাপ বুঝে উঠতে লাগলাম। আহা, কী চমৎকার ব্যবস্থা!

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চৈনিক পার্কগুলো একদম জমজমাট! এর মাঝে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বে বৃদ্ধ নারী-পুরুষদের কার্যক্রম। শরীর ভালো ও মনকে ফুরফুরে রাখার কী যে এক অসাধারণ প্রচেষ্টা তাদের মাঝে! দেশে কোনোদিন পার্কে দৌড়তে যাইনি ইভটিজিং আর ছিনতাইয়ের ভয়ে। অথচ এখানে রাতে পার্কের সদর দরজা বন্ধ হবার আগ পর্যন্ত থেকে যাই হাঁটতে বেরোলে! কোথাও কোথাও লেক, কোথাও বা পাহাড় আবার কোথাও বা জঙ্গলকে কেন্দ্র করেও পার্ক গড়ে ওঠে এই দেশে। সবই এক স্বাস্থ্যসচেতন জীবনধারাকে উৎসাহ দেবার জন্যেই বুঝি! আমাদের দেশে চল্লিশোর্ধ্ব মা-খালাদের জীবনে সারাদিন গা-ভাঙা পরিশ্রমের পর বিনোদনের আর কোন সুযোগ থাকে না। হয় ভাত খেয়ে ঘুম দেন নতুবা টিভি খুলে হিন্দি সিরিয়াল দেখেন। বেশিরভাগ বাড়ির চিত্রই কিন্তু তা বলে। বয়েস হবার আগেই যেন বুড়িয়ে যান অনেকে। সত্যি বলতে, আমাদের দেশে কী শিশু, কী বয়োঃ, কী বৃদ্ধ, কারও জন্যেই কিন্তু সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকারী বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। আর চীনদেশে? ষাটোর্দ্ধ দাদিমাকে দেখেও মনে হবে বড়জোড় ৪৫ বছরের কেউ! কেমন করে? বলছি।

ঐতিহ্যবাহী নাচের অনুশীলন করছেন প্রবীণারা

ওয়াটার ক্যালিগ্রাফি করছেন দাদু

অনেকেই সকালবেলায় পার্কে আসেন পোষা প্রাণীর সাথে নিজেও একটু হেঁটে নেবেন বলে। আবার কেউ কেউ আসেন বাজার করে বাড়ি ফেরার আগে সারাজীবন ধরে শিখে আসা মার্শাল আর্ট, ঐতিহ্যবাহী নাচ ইত্যাদি সকালবেলায় একটু ঝালাই করে নিতে। সপ্তাহে কোনোদিনই যেন এর হেরফের নেই। আপনি চাইলে যেকোন এক দলের সাথে ভীড়ে গিয়ে উপভোগ করতে পারেন এই অসম্ভব ভালো লাগার চর্চাগুলোকে।

এ তো গেল সকালবেলার কথা। বিকেলে বের হলে দেখবেন জমজমাট ব্যাপার কাকে বলে! শারীরিক চর্চার পাশাপাশি তখন চলে সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও প্রদর্শনী! পার্কের এক লাইন ধরে পাওয়া যাবে ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও স্যুভেনিরের দোকান, সেই সাথে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসী ফটো স্টুডিও। সেখানে মাত্র ১০ ইউয়েন দিয়ে আদিবাসী পোশাক পরে ছবি তুলিয়ে নিতে পারবেন তাদের দিয়ে। ভেতরে আরও আছে নান্দনিক রেস্তোরাঁ। অনেকসময় রেস্তোরাঁর দালানে ঝুলতে থাকা লণ্ঠনগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়া যায়। আরও রয়েছে চা শিল্পের প্রদর্শনী, ফ্রি জিম ফ্যাসিলিটি, তলোয়ার নাচ ও লায়ন/ড্রাগন ড্যান্সের প্রদর্শনী! কী নেই?

আদিবাসী পোশাকের দোকান, চাইলে নিজের
গায়ে জড়িয়ে ছবি তুলে নিতে পারেন

ঠিক যেন শাহবাগের ছবির হাটের একটি দৃশ্য!

সুই হু পার্কের ভেতরের জাকজমক রেস্তোরাঁ

রয়েছে নাম না জানা সব ফুলের সমারোহ আর হাত
থেকে খাবার খেয়ে যাওয়া নিষ্পাপ পশুপাখিরা

রয়েছে নাম না জানা সব ফুলের সমারোহ আর হাত
থেকে খাবার খেয়ে যাওয়া নিষ্পাপ পশুপাখিরা

পার্কের আনাচে কানাচে প্রচুর স্ট্রিটফুড চেখে দেখারও রয়েছে সুযোগ। আর ফুলের কথা কী বলব! সারা চীনদেশে রয়েছে চেনা-অচেনা অসংখ্য ফুলের সমাহার। পার্কই বা তা থেকে বাদ যাবে কেন? মাঝে মাঝে কেবল ফুল দেখার জন্যেই অনেকে ক্যামেরা হাতে বের হয়ে পড়েন। তাছাড়া মানুষের হাতে পাখি কিংবা কাঠবিড়ালীর এসে খাবার খেয়ে যাবার এমন অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য আমি আর কোথাও দেখিনি!

কখনও কখনও দেখা হয়ে যাবে বিদেশিদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আসা চাইনিজ পিচ্চিদের সাথে। বিদেশি বন্ধু বানানো এখানকার ছেলেপেলেদের শখের মতন। নিজেকে সেলিব্রিটি ভাবার এমন সুযোগ আর কোথাও হয়ত পাওয়া যাবে না!

কোথাও বা দেখা যাবে ব্রাইডাল ফটোশুট কিংবা সিনেমার লাইভ শ্যুটিং! আহা!

খুনমিং এর তিয়েন ছি লেক পার্কের ভেতর ব্রাইডাল ফটোশ্যুট

জমজমাট লাইট শো

পার্কের মূল ঝলকানি দেখা যাবে আরেকটু অন্ধকার হলে। এদিক সেদিক থেকে নানারকম বাজনা আর অপেরা সঙ্গীতের মূর্ছনায় হারিয়ে যাবেন কোথায় যেন। ভীড় থেকেই হঠাৎ কোন লাস্যময়ী বৃদ্ধার হাত এসে আপনাকে টেনে নেবে তাদের দলের সাথে নাচের আহ্বান নিয়ে।

কোনো কোনো পার্কে আবার জমে ওঠে লাইট শো-এর আয়োজন! একটু কি ক্লান্তও লাগে মাঝে মধ্যে? চিন্তা নেই, জনশূন্য পরিবেশে হারিয়ে যাবার সুযোগও কিন্তু রয়েছে।

বসেছে বাদ্যযন্ত্রের পশরা!

ইউন্নানের আননিং এর একটি পার্কের উদ্বোধনী মেলার জমজমাট আয়োজন

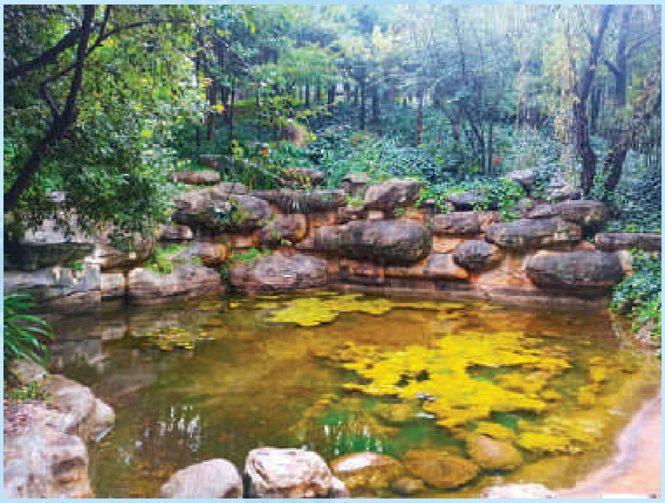

রয়েছে নিভৃতে হারিয়ে যাবার ব্যবস্থাও
(ছুন রোং পার্ক, খুনমিং)

আমার কাছেতো পার্কের ফটককেও খুব
স্পেশাল কিছু মনে হয়!

তবে হ্যাঁ! আমার নিজের দেশের পার্কের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে, যা আমি চীনদেশে পাইনি! তা হল বই মেলা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতরে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে এখন যে মেলা হয়, তার উন্মাদনা এখানে নেই। কিন্তু সেই সাথে এরকম স্পোর্টি লাইফস্টাইল নিয়ে পাগলামোও কিন্তু আমার দেশের পার্কে নাই। তবে চাইলেই আমরা তা বরণ করে নিতে পারি। আমিতো খুবই উৎসাহী! সংস্কৃতির মাধুর্য্যকে একই সঙ্গে লালন করে যাওয়া আর শরীর-মন-স্বাস্থ্যকে সতেজ রেখে বয়েসকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারা কি চাট্টিখানি কথা?

লেখক নুজহাত ফারহানা
চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি, ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয়
খুনমিং, ইউন্নান, চীন

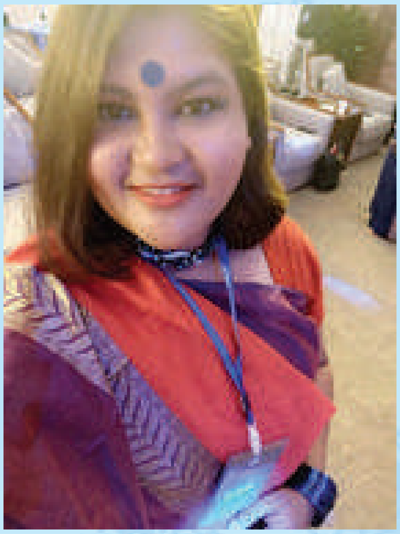

মেঘের রাজ্যে বসন্ত

মিশকাত শরীফ

যদি বলি মেঘের দেশ, যদি বলি ফুলের রাজধানী কিংবা যদি বলি চিরবসন্তের নগরী তুমি কি তবে একটি দেশ, একটি রাজধানী কিংবা একটি নগরীর নাম বলতে চাইবে? হয়তোবা। তবে আমি তোমাকে শুধু একটি নাম বলবো যা মেঘ, ফুল আর বসন্তের নগরীর গল্প শোনাবে তোমায়।

যদি বলো কোথায়? কতদূর? আমি বলবো তোমার খুব কাছেই! বাংলাদেশ থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার যাত্রাপথ বিমানে। তুমি ঢাকায় দুপুরে বিমানে চেপে বসো, পাইলট তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ২০,০০০ মিটার উপরে। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখ, তুমি আকাশের অনেক অনেক উপরে উড়ে বেরাচ্ছ। বিমান মেঘের স্তর পার হয়ে আরো উপরে ওঠার সময় পাইলট তোমায় অভয় বাণী শোনাবেন। বলবেন, "প্রিয় যাত্রীগণ, আমরা এখন মেঘের স্তর অতিক্রম করতে যাচ্ছি, বিমান বাফারিং করতে পারে আপনি ভয় পাবেন না। তুমি অনুভব করবে বিমান থরথর করে কাঁপছে। তুমি কি ভয় পেয়েছিলে? হয়তবা! তুমি তখন জানালা দিয়ে তাকাও, দেখতে পাবে বিমান ঘন মেঘের স্তর নিজের শক্তি নিয়ে ভেদ করে যাচ্ছে। তুমি এবার বিমানকে পাবে শান্ত ও স্থিরভাবে। জানালার বাইরে তাকাও, দেখবে চারিদিকে মেঘের সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধুই মেঘ আর আর মেঘ। আমি জানি তুমি মনে মনে বলবে, "আরে! এ তো মেঘের সমুদ্র! আর আমরা হাওয়াই জাহাজে সমুদ্র অতিক্রম করছি।" তুমি দেখতে পাবে ইয়া বড় বড় মেঘের পাহাড়। ভয় পেয়না। পাইলট ভুল করে সেই পাহাড়ের চূড়ায় হাওয়াই জাহাজ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বেনা, যেমনটি টাইটানিক এর জাহাজের সাথে আটলান্টিকের বরফ খন্ডের হয়েছিলো।

তুমি বলবে, "আহ! কী অপরূপ দৃশ্য!" মনে মনে কামনা করবে, "ইশ! যদি আমার বাড়ি এই মেঘেদের দেশে হতো!" তোমার কল্পনার মাঝে এবার বাগড়া বাজাবে এক সুন্দরী কোনো রমণী। তোমাকে সুন্দর একটি হাসি দিয়ে বলবে, "জনাব, আপনি কী খাবেন? কী পান করতে পছন্দ করেন?" বিরক্তি বোধ করেছিলে কিনা জানা নেই, তবে সুন্দরী বিমানবালার হাসিমাখা মুখ তোমার বিরক্তি লুকিয়ে রাখতে বাধ্য করবে। খেতে ইতস্তত না করে তৃপ্তি সহকারে খেও, কারন সুন্দরী বিমানবালা তোমাকে হালাল খাবার সরবরাহ করবে। খাবার শেষে তুমি পানীয় হিসেবে আপেল, কমলা অথবা আমের জুস নিতে পারো। ওহ, ভুলে গেছি! চাইলে কোকাকোলাও পান করতে পারো। খাবার শেষে পাইলট এবার তোমাকে বলবে, "প্রিয় যাত্রীগন, আমরা আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই খুনমিং ছাংশু'য়েই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি, দয়া করে সিটবেল্ট বেঁধে নিন।" এবার তোমার মন উদাস হয়ে যাবে বাইরে মেঘের সমুদ্রজলের ঝাপটায়। আগের মতো তুমি আবারো ঘন মেঘের স্তর পার হবে থরথর কাঁপুনি নিয়ে।

তুমি কোন মাসে যাত্রা করবে তা আমার জানা নাই, তবে এটুকু জানা আছে যে, তুমি যে মাসেই যাত্রা কর না কেন এবার পাইলট তোমাকে একটা কথা অবশ্যই শোনাবেন "প্রিয় যাত্রী, আমরা এখন ইউন্নান প্রদেশের রাজধানী খুনমিং এর আকাশে, স্থানীয় সময় বিকেল ৫ টা বেজে ৩০ মিনিট, এখন বাইরে প্রায় ১৬।" হ্যাঁ, তুমি সেই কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছে গেছ। তুমি ভেবো না পাইলট তোমাকে নিয়ে সাড়ে তিন ঘন্টা আকাশে উড়ে বেড়িয়েছে, কারন ঢাকায় তোমাকে নিয়ে আকাশে উড়ার সময় সে তোমাকে বলেছিলো "এখন সময় দুপুর ২টা। সে তোমাকে নিয়ে মাত্র দেড় ঘন্টা উড়ার পর চীনের আকাশ সীমায় পৌঁছেছে, তবে খুনমিং এর স্থানীয় সময় ঢাকার সময় থেকে ২ ঘন্টা এগিয়ে। আর ঢাকায় তুমি হয়তো গরমে ঘেমে অস্থির হয়ে উঠছিলে অথবা ঠান্ডায় বিরক্তি প্রকাশ করছিলে। তুমি ঢাকা থেকে যে আবহাওয়াই ত্যাগ করে আসো না কেন, এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে স্নিগ্ধ শীতলতা। আবহাওয়া সবসময় গড়ে ১৬.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে। সুতরাং তুমি যদি ঢাকায় গরমে ঘেমে ভিজে গিয়ে থাকো, তবে বিমান থেকে নামার আগেই তুমি শীতলতায় মনের অজান্তেই গায়ে হালকা গরম কিছু জড়িয়ে নিবে। আর যদি ঢাকায় শীতের রুক্ষতা তোমায় আহত করে থাকে, তবে খুনমিং এর আবহাওয়া তোমায় করবে উষ্ণ। সময় আর আবহাওয়ার রহস্যে তুমি যখন বিভোর ঠিক তখনি তুমি হয়তো জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভয়ে বিহ্বল হতে পারো! তুমি বলবে আরে আরে পাইলট করছে কি, মেঘের পাহাড় চূড়ায় আছড়ে পড়লো না সে এখন দেখি মাটির পাহাড় চূড়ায় আছড়ে পড়তে যাচ্ছে। আরো কাছে আসলে মনে হবে পাইলট ব্যাটা এবার শীতলতায় বিমান নিয়ে ইয়া বড় এক ঈগল ডানার নিচে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছে। ভয় পেয়োনা। পাইলট কোন ভুল করছেনা, এটিই খুনমিং ছাংশুয়েই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। তুমি ভুল দেখনি। এটি পাহাড় চূড়ায় নির্মিত আর দেখতে এক বড় ঈগলের মত যে কিনা তার দু'ডানা মেলে ধরে আছে। আর তার পালকের মতোই বিমান বন্দর সোনালি রংয়ে বর্ণিল। তুমি হেঁটে অগ্রসর হয়ো না, কারণ তুমি হাঁটতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তুমি চলমান ফ্লোর এস্কেলেটরে দাঁড়িয়ে পড়, সে তোমাকে সামনে নিয়ে যাবে। এটি চীনের অন্যতম বৃহত্তম বিমানবন্দর। ৭৮ টি গেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তোমার অপেক্ষায়। তুমি তোমার পোটলা-পুটলি সংগ্রহ করে ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়। কাস্টম কর্মকর্তাদের জানান দাও তুমি এখন মেঘের দেশ, ফুলের শহর, চির বসন্তের নগরীতে পৌঁছে গেছ। তুমি এবার এক্সিট গেট দিয়ে বেরিয়ে চোখ তুলে তাকাও। এবার কিছু দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ, তুমি দেখতে পাবে বড় অক্ষরে লেখা "Welcome To The Capital Of Flower, The City of Eternal Spring." তুমি ইতোমধ্যেই পৌঁছে গেছ মেঘের দেশ, ফুলের রাজধানী, চির বসন্তের নগরী খুনমিং এ।

ইউন্নান। সে এক বিস্ময়! চীনের পর্যটন স্বর্গরাজ্য বলা হয় ইউন্নানকে। স্বর্গে স্বর্গবাসীগণ পবিত্র সুরা পান করবেন। তারা সেথায় মাতাল হবেন কিনা আমার জানা নেই, তবে এখানে প্রকৃতি তোমায় ক্ষণে ক্ষণে মাতাল করতে তোমার পিছু লেগে থাকবে। তুমি শুনতে চাইবেনা কেন? সে উত্তর না হয় তুমি মাতাল হয়েই খুঁজে নিও।

ইউন্নানে রয়েছে চীনা দুটি শব্দ। একটি হল 'ইউন' আর অপরটি 'নান'। 'ইউন' মানে মেঘ আর 'নান' মানে দক্ষিণ। তার মানে তুমি চীনের সর্বদক্ষিণে মেঘের কোলে অবস্থান করছো। ইউন্নানকে চীনারা মেঘের দেশ বলেই ডেকে থাকে।

খুনমিং। একইসাথে ফুলের রাজধানী, চিরবসন্তের নগরী আর মেঘের দেশ ইউন্নানের রাজধানী। খুনমিং পৃথিবীতে একটি বিখ্যাত শহর তার আবহাওয়ার কারণে। স্বচ্ছ নীল আকাশ খুনমিং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সারাদিন কেমন যাবে তা নাকি সকালের সূর্য দেখে বোঝা যায়, এই কথা তোমায় ভুলে যেতে বাধ্য করবে খুনমিং। খুনমিং এর আকাশ-বাতাস এক সুঁতোয় বাঁধা। তুমি সকালে আকাশকে দেখেছ মিষ্টি হাসি দিতে, ভাবলে

সারাদিন হয়তো এমনটাই যাবে। তুমি হয়তো হালকা কাপড় পরে বেড়িয়েছ। তবে প্রতারিত করবে বাতাস। তোমার দেখা নীলাকাশ কে মুহূর্তেই কালো আকাশ বানিয়ে দিবে খুনমিং এর মৃদুমন্দ বাতাস। আর মুহূর্তেই মেঘেরা বৃষ্টি হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তোমার উপড়। বৃষ্টির সাথে সাথে তাপমাত্রা হয়তো নেমে যাবে ৭-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এ এমনই ছলনাময়ী এখানকার আবহাওয়া!

খুনমিং তোমায় দেবে প্রাণ খুলে শ্বাস নেবার সুযোগ। খুনমিং তিনদিক থেকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা আর একদিকে উন্মুক্ত। উন্মুক্ত বললে ভুল হবে কারণ, একদিক তিয়েন ছি লেকের জলে সিক্ত। তিয়েন ছি চীনের অন্যতম স্বচ্ছ বড় লেকের মধ্যে অন্যতম। একে বলা হয় "Oxygen Bar." তিনদিক পাহাড় আর একদিক স্বচ্ছ পানির লেক খুনমিংকে সর্বদাই রাখে পরিশুদ্ধ।

পশ্চিমা পাহাড় ঘেরা তিয়েন ছি লেকে শীতের বেলায় বেড়াতে আসা অতিথি পাখিরা
(ছবিসূত্রঃ absolutechinatours.com)

ফুলের রাজধানী খুনমিং। সারাবছর বিভিন্ন ফুলের সমারোহ যেন তার দেহের অলংকার। আবহাওয়া যেন নারীর মন। আসলেই খুনমিং এক যৌবনা নারী। খুনমিং এর সড়ক সারা বছর বিভিন্ন ফুলে ফুলে সজ্জিত। তুমি যখন খুনমিং এ নতুন, তখন হয়তো ভাববে কী সব পাতা বিহীন হাড্ডিসার গাছে মাইলের পর মাইল ভরিয়েছে, যেমনটি আমি ভেবেছিলাম। তবে ঐ পাতা বিহীন গাছই যে একসময় ফুলে ফুলে বর্ণিল হবে তা অকল্পনীয়। খুনমিং এর সড়কে কোনো ফলের গাছ পাবে না। তুমি যদি কোনো সড়কে হলুদ কোনো ফুল দেখ, তার ধারাবাহিকতা পাবে কয়েক মাইল পর্যন্ত এরূপ সব ফুলের ক্ষেত্রে। সড়কের ধারে বড় গাছ নাই বললেই চলে। যা দেখবে সব বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের গাছ। আর ফুলে ফুলে পুরো খুনমিং যেন কোন ফুলের বাগান। বিশেষত বসন্তের দিনগুলা খুনমিংকে দেয় নববধূর সাজ। খুনমিং নিত্যদিন নিজেকে ফুলে ফুলে সজ্জিত করতে বদ্ধপরিকর। এখানে তুমি একই ফুল দেখতে দেখতে কখনোই একঘেঁয়ে বোধ করবে না, কারণ এখানে কোনো ফুল হয়তো এক সপ্তাহ তার রূপ প্রদর্শন করবে, অতঃপর সে ঝরে পড়বে। আবার অন্য প্রজাতির ফুল তোমায় দেখা দেবে। এ যেন পুরাতনের স্বেচ্ছায় অবসর আর নতুনকে সুযোগ করে দেয়া। তুমি চেরী ফুলের পাবে বিভিন্ন রং। গাঁদা ফুল যেন রংয়ের চেয়ে তার মিষ্টি গন্ধে তোমায় মাতাল করতে প্রস্তুত। খুনমিং ফুলকে শুধু পথিকের আনন্দের খোরাকই দেয়নি, দিয়েছে বিশ্ব দরবারে অন্যতম বড় ফুল শিল্পের অবস্থান। খুনমিং ও ইউনানের বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষাধিক হেক্টর জমিতে হচ্ছে সহস্রাধিক প্রজাতির ফুলের চাষ। খুনমিং এ গড়ে উঠেছে এশিয়ার সর্ববৃহৎ ফুল বাজার। এখান থেকে প্রতিদিন ফুল ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। তৌনানে এই ফুল বাজারের অবস্থান।

খুনমিং এর সবচাইতে বড় ফুলের বাজার তৌ নান (ছবিসূত্র: CGTN)

লাল গোলাপ, তা তোমার হাতে দিবো দিবো করেও সাহস হয়নি। সময় ফুরিয়ে গেছে, গোলাপের পাপড়িও সব ঝরে গেছে। এখন মনের বাগানে আর গোলাপ ফোটেনা। তবে স্রষ্টা আমাকে চিরবসন্তের নগরীতে এনেছেন গায়ে বসন্ত হাওয়া লাগাতে। কেউ আমার মন না বুঝলেও তিনি বুঝতে পেরেই এ নগরীর বাসিন্দা করেছেন তার নিজ কৃপায়। এখানে ভালবাসাকে মেঘেরা পূজো করে। এই রাজ্যের লোকেরা ভালবাসার প্রতীক লাল গোলাপকে মাটিতে ঝরে পড়তে দেয় না। তারা গোলাপকে ভক্ষণ করে। গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তৈরি করে মুন কেক। আর এই ভালবাসার পাপড়ি দিয়ে বানানো কেক ছড়িয়ে পরে চীনের আনাচে কানাচে। সকলেই মেঘের রাজ্যের ভালবাসার গোলাপ একে অপরকে উপহার হিসেবে দেয়। জানান দেয় তার মনের ভালবাসার ঘ্রাণ। প্রতিটি কামড়েই ভালবাসার অনুভব। চীনারা প্রযুক্তিতে এগিয়েছে, তবে খুনমিং এর এই বিশেষ কেক অন্য কোথাও তৈরির সাহস করেনি। এ যেন তার নিজস্বতা।

মেঘের রাজ্যে এক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছে নাম তার ইউনতা, যাকে আমরা ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয় বলে জানি। তবে চীনারা তাকে ইউনতা বলেই ডাকে। তুমি কি জানো কেন? 'ইউন' মানে মেঘ আর "তা" মানে বিশ্ববিদ্যালয়, মানে মেঘের কোলে বিশ্ববিদ্যালয়। মেঘ ছুঁই ছুঁই পাহাড়-চূড়ায় তার রয়েছে লালগোলাপ বাগান। প্রভাতে আর বিকেলে মেঘের কোলের শিক্ষার্থীরা গোলাপ বাগানে গিয়ে স্নিগ্ধতা উপভোগ করে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাগানের গোলাপ কলি সব ফুটে, তাই তার পাপড়ি অত্যন্ত যত্নের সাথে সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হয় রান্নাঘরে। সেখানে রয়েছে দক্ষ ও পেশাদার গোলাপ রাঁধুনি। কেএফসির চিকেন ফ্রাই বিখ্যাত হতে পারে, তবে ইউনতার গোলাপ পাপড়ি ফ্রাই চীনে বিখ্যাত। ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিন তার গোলাপ পাপড়ি ফ্রাই এর জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। প্রতিদিনের খাবার মেনুতে মিলে এই লালগোলাপক। প্রতিটি কামড়েই তুমি পাবে ভালবাসা। মনে হবে ভালবাসার প্রতীক লাল গোলাপকে তুমি হজম করছো, যেন তুমি নিজেই ভালবাসার প্রতীক হয়ে উঠছো। তোমার রক্তের প্রতিটি কণাই যেন ভালোবাসা।

ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিনের বিখ্যাত মুচমুচে গোলাপ পাঁপড়ি ভাজা (ছবিসূত্রঃ ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট)

এবার যে যাবার সময় হলো। ফিরতে হবে যে ঢাকায়। খুনমিং ছাংশুয়েই বিমানবন্দরে ঢাকাগামী বিমানে তুমি পূর্বের ন্যায় আসন গ্রহণ করো। পাইলট তোমাকে নিয়ে আকাশে উড্ডয়নের সময় পূর্বের ন্যায় শোনাবেন, "প্রিয় যাত্রীগণ, এখন স্থানীয় সময় দুপুর ২ টা।" এবার আর আকাশে ওড়ার সময় জানালার বাইরের দৃশ্য তোমাকে আগের মতো টানবে না। তোমার মন পড়ে রয়েছে মেঘের দেশের কোন পথে প্রান্তরে। তোমার চোখের সামনে ভাসছে অপরূপ ইউন্নানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় কোন দৃশ্য। তোমার মন যখন ভারি আর স্থির তখন তো বিমান স্থির নয়। বিমান তার নিজ গতিতে দু'ঘণ্টা উড়ে এসে ঢাকায় অবতরণ করলো। পাইলট তোমায় শোনাবেন, "প্রিয় যাত্রীগণ, আমরা এখন ঢাকার আকাশে। স্থানীয় সময় দু'টা। আমরা আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অবতরণ করতে যাচ্ছি।" তুমি তখন মনে মনে ভাবছো, "খুনমিং থেকে তো দুপুর দুইটায় উড্ডয়ন করলাম আবার ঢাকায় সেই দুপুর দুইটায় অবতরণ করলাম। তবে কি সময় থমকে ছিলো? নাকি আমি স্বপ্নের ভিতর ছিলাম।! তবে কি পাইলট যখন ঢাকায় আমাকে নিয়ে খুনমিং এর উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করেছিলো, সে কি কোন স্বপ্নের দেশে পৌঁছেছিলো, যেখানে আমি এতদিন স্বপ্নের মাঝে অতিবাহিত করেছি? সেখানে কি সময় থমকে ছিলো? যেমনটি হয়েছিলো নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিরাজ গমনকালে? নাকি আমি বিভোর ছিলাম?"

লেখক - মিশকাত শরীফ
ব্যাচেলর শিক্ষার্থী, চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি, ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয়
খুনমিং, ইউন্নান, চীন

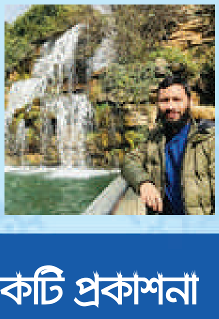

বান্দরবানে বৈসাবী উদযাপন

ছবির ক্যাপশন দিতে চাইলে শুরুতেই বলতে হয় 'সে এক বিরাট ইতিহাস' ঘটনা হচ্ছে, সাতসকালে আমরা গিয়েছিলাম বান্দরবান রাজার মাঠে আদিবাসীদের 'জলকেলি উৎসব দেখতে। গিয়ে দেখি রাজার মাঠ তো পুরাই গড়ের মাঠ! ভগ্ন হৃদয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম কই? কিছুক্ষণ পর পর দেখি ইদ্দুরি ইদ্দুরি পোলাপান 'পানিবন্দুক' দিয়ে আমাদের ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একটু পর আবার, কোনো অ্যাকশন মুভির মতো অটোতে (ইয়েস, আই রিপিট অটো-টেম্পু) করে এসে জেমস বন্ডেরা অতর্কিত আক্রমণ চালাচ্ছিলো। পার্থক্য একটাই, গুলির বদলে পানি! ছুঁড়তে দেরি আছে, ওদের হাওয়া হতে দেরি নাই। "লজ্জাবতী উদ্ভিদেরা হাজারো 'টীজ' খাইয়া সহ্য করিতে পারে কিন্তু আমরা সে পথ বাছিয়া লইবো কেনে-া?" ধর তক্তা, মার পেরেক। চান্দের গাড়ি ভাড়া করা হলো, ড্রাইভার সাহেব আমাদের উৎসাহ দেখে স্ব-উদ্যোগে নিজ বাড়ি থেকে দু'টো বালতি এবং পাস্টিকের বোতল কেটে মগ এর মতো বানিয়ে দিলেন। বাচ্চারা যেভাবে খেলনা পেয়ে আহ্লাদিত হয়ে উঠে, আমরা তারও এক কাঠি উপরে উঠে 'ডাবল-আহ্লাদিত' হয়ে গেলাম। সাঁই সাঁই করে চান্দের গাড়ি যাচ্ছে আর আমরা ধর্ম-বর্ন-বয়স নির্বিশেষে সবাইকে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। একটু আগে যে পিচ্চি গুলো আমাদের ভেজাচ্ছিলো, আমাদের প্রতি-আক্রমণে ওরা 'আমরা তো ছেলে, আমরা তো ছেলে' বলে বাঁচতে চাইছিলো। কারণ এ খেলায় নিয়ম হচ্ছে, ছেলে মেয়েকে মারবে, মেয়ে ছেলেকে মারবে। কে শোনে কার কথা? দে, ঝপাস! আমরাও যে শুধু অন্যান্য অটো বা চান্দের গাড়ির পানি-আক্রমণের শিকার হচ্ছিলাম তা না। উপর্যুপরি গেরিলা আক্রমণও চলছিলো। এই গাছের উপর থেকে তো, ওই দুই বাড়ির মাঝখান থেকে, কিংবা বাসার ছাদের উপর থেকে বিদেশিদের মুহুর্মুহু গেরিলা আক্রমণের শিকার হচ্ছিলাম। গোলাবারুদ (বালতির পানি) শেষ? চিন্তা নেই। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে অন্যদের থেকে গাঁ বাচিয়ে পুকুরের সবুজাভ পানি দিয়ে ওয়াপন রিচার্জ করছিলাম। তারপর আবার আক্রমণ !

এখন অব্দি আমার জীবনের সেরা 'পহেলা বৈশাখ' উদ্‌যাপন এটি। ঐদিনের বান্দরবন শহরের প্রতিটি ভেজা রাস্তা সে সাক্ষীই দিচ্ছে।

পুনশ্চঃ মারমা সম্প্রদায়ের একজনের সাথে কথা বলে জানা গেলো, উনারা বিশ্বাস করেন এ পানি শরীরে না লাগালে আসছে বছরে তাদের ভীষণ রোগ-শোকের সম্ভাবনা থাকে।

লেখক - মোঃ ইকবাল হোসেন
Team Leader, Microsoft O365
Wicresoft, Shanghai

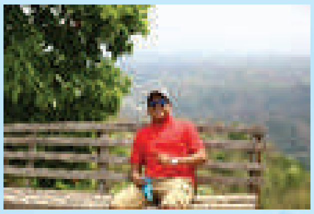

চীনের নিংশিয়া মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের করোনার দিনগুলি

দেখেছি মানুষের জীবনের মায়া কি জিনিস। ছুটতে দেখেছি সেইসব মানুষকে যারা বলতো জীবনের মায়া নেই, যে যেভাবে পারছে নিজের জীবন বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে চলেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন দেখেছি। কিভাবে একটা শহর ভুতুড়ে রূপ ধারণ করে, চারপাশে জনমানবশূন্য, দিনের বেলায় হাহাকার অবস্থা, শুধুমাত্র রাতের বেলায় উঁচু দালানগুলোর ভেতর থেকে মিটি মিটি আলো জ্বলতে দেখতে পেতাম। ব্যতিক্রমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সবসময় সহজ নয়, তবে একেবারে অসম্ভব ও নয়। তারপরও মাঝে মাঝে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয় আমাদের। ঠিক তেমনি এক সময় পার করছিলাম আমাদের মতো কিছু শিক্ষার্থী। বলছিলাম চীনের নিংশিয়া প্রদেশে অবস্থিত নিংশিয়া মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিছু বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের কথা-সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিলো, সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা মাত্র শেষ হলো। এরই মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী শীতকালীন ছুটিতে দেশে ফিরে গেছে। হঠাৎ করে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে করোনা নামক ভাইরাসটি মহামারী রূপ ধারণ করে। তাছাড়া ২০ জানুয়ারি পর ভাইরাসটি চীনের সকল শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী গণমাধ্যমগুলোর মূল সংবাদ ছিল চীনে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাস, যা শুনে মাঝে মাঝে বুকটা কেঁপে উঠতো। পরিবারের সবাই বলছিলো তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসতে।

ইতোমধ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকা অধিকাংশ শিক্ষার্থী আতংকিত হয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য পরিবারের চাপে তারা চীন ছেড়ে স্ব-স্ব দেশে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী দেশের স্বার্থের কথা ভেবে এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এরপর শুরু হলো আমাদের বন্দী জীবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আমরা ১৫ জন শিক্ষার্থী ও কিছু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ছাড়া কেউই ছিলনা। কারণ, নিউ ইয়ারের ছুটিতে প্রায় সকল শিক্ষকই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নোটিশ এলো এই মর্মে যে, ক্যাম্পাসের সব গেট বন্ধ এবং বিনা অনুমতিতে বাইরে যাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। এর সাথে সাথে চায়নিজ সরকার বাড়তি নজরদারি শুরু করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়ন করে। আমরা রুমেই তালাবদ্ধভাবে থাকি। খাবার ও প্রায় শেষ হয়ে আসছিলো। চারদিকে শুধু বেঁচে থাকার আকুতি-মিনতি। জানালা খুলে যখন বাহিরে তাকাতাম কাউকে দেখতে পেতাম না, সব নিশ্চুপ। এটাকে এক প্রকার গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির মতো বলা চলে। আমরা সবাই চোখে না দেখা এক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলাম।

অনেক আগেই আমাদের শহর লকডাউন হয়ে যায়, শুধুমাত্র ফার্মেসি খোলা আর নির্দিষ্ট একটা সময়ে কিছু সুপার-শপ খোলা থাকতো। মাঝে বেশ কয়েকদিন খুব খাবার সংকটে পড়েছিলাম। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে থাকা শিক্ষার্থীদের খাবার এবং সকল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে। সকল জিনিসপত্র তারা আমাদের রুমে এনে পৌঁছে দিত। মাস্ক ও স্যানিটাইজার সংকট ছিল তবে আমাদের বিনামূল্যেই বিতরণ করে চায়নিজ সরকার।

আমাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে চায়নিজ সরকার কিছু স্বেচ্ছাসেবক কর্মী নিয়োগ করে, তারা প্রতিনিয়ত আমাদের দেখভাল করার পাশাপাশি দিনে ৩-৪ বার রুমে এসে শরীরের তাপমাত্রা মাপতো। আমাদের মনের ভিতর আরো সাহস বেড়ে মনে হচ্ছিল আমরা একেকজন সাহসী যোদ্ধা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা **(WHO)** দেওয়া সকল নিয়মাবলী মেনে চলতে থাকি। এভাবেই প্রায় দেড়মাসের বেশি সময় চলতে থাকলো।

দেখলাম একটা ভাইরাস কিভাবে একটা দেশকে বিপর্যস্ত করে দিল, তছনছ করে দিল সবকিছু। ভাইরাস ইতোমধ্যে বিশ্বের সবদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের চিকিৎসক সমাজ এবং নার্সগণ তাদের জীবন বাজি রেখে করোনা রোগীদের সেবা করে তারা আজ বিশ্বের কাছে রোল মডেল। চায়নিজ সরকারও তাদের সক্ষমতা প্রমাণ করলো।

চীনের ১৪০ কোটি মানুষ এবং চীনে অবস্থানরত প্রবাসীরা সতর্কতা এবং আতংকের সাথে দিনগুলো পার করেছিলো। এমন বিপদঘন মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো নিজে নিরাপদে থাকার পাশাপাশি অপরকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করা, সচেতনতা বাড়ানো, গুজবে কান না দেওয়া এবং গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকা। চীন পেরেছে করোনাকে জয় করতে এবং আশা করি শিগগিরই এ ভাইরাসকে জয় করতে পারবে বিশ্ববাসী। সবশেষে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান থাকলো এমন দুর্যোগ মুহূর্তে নিজে সচেতন থাকুন, ঘরে থাকুন -নিরাপদ থাকুন, গুজব ছড়ানো বা গুজব থেকে দূরে থাকুন এবং **(WHO)** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সকল নিয়ম মেনে চলুন। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

লেখক-সূর্য সারথী সরকার দেব
নিংশিয়া মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, নিংশিয়া, চায়না

চীনা ভাষার মাত্রা বিভ্রাট

বয়েল্ড ডামপ্লিং

চীনা ভাষায় মাত্রার ব্যবহারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবার একইসাথে বেশ খানিকটা মজারও! মাত্রার একটুখানি তারতম্যে খুব সাধারণ একটি কথা হয়ে যেতে পারে গালি আর গালি হয়ে যেতে পারে স্বাভাবিক একটি বুলি! চীনে এসে ভাষার এই মাত্রা বিভ্রাটের পাল্লায় পড়েনি, এমন বিদেশি কাউকে বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চীনা ভাষায় মুখ্য মাত্রা রয়েছে চারটি, আর গৌণ মাত্রা রয়েছে একটি। আজকে খুব গভীরে যাব না। কেবল মাত্রা বিভ্রাটের এই বিপুল সম্ভাবনা কী করে একটি ভাষাকে মজাদার করে তুলতে পারে, তার কিছু উদাহরণ নিয়ে কথা বলে যাব একটুখানি!

ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষার মেজর শুরু করার আগে বাধ্যতামূলকভাবে ফান্ডামেন্টাল ল্যাংগুয়েজ কোর্স করতে হয়েছিল প্রথম বছরে। তো আমার সেই ক্লাসে সার্বিয়ার এক বন্ধু ছিল, ওর নাম ভাসিলিয়া। ঘুরতে সে ভীষণ ভালবাসত। তো এমনই একবার এক গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সারাদিন ঘোরাফেরা করতে করতে তার সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাতের খাবার খেতে ঢুকল গ্রামের এক ছোট্ট খাবারের দোকানে। সেখানে বিক্রি হচ্ছিল সেদ্ধ ডামপ্লিং। সেদ্ধ ডামপ্লিং কে চীনা ভাষায় ডাকা হয় 'চিয়াওয্যি', অর্থাৎ পানির ভেতর ডামপ্লিং। দোকানের দোকানী ছিল এক লাস্যময়ী তরুণী। অর্বাচীন ভাসিলিয়া ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "**Shuìjiào duōshao?**" মুহূর্তে রাগে লাল হয়ে উঠল তরুণীর মুখ! কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যাপারখানা বুঝে নিয়ে নিজেকে সামলে নিল সে তরুণী। আসলে হয়েছে কী? মাত্রার উচ্চারণগত ভুলে ভাসিলিয়ার কথার অর্থ দাঁড়িয়েছিল, "ঘুমুতে কত নেবে?" 'শুই চিয়াও' শব্দটি শুনতে এক মনে হলেও মাত্রার তারতম্যে এদের অর্থে রয়েছে বিস্তর ফারাক। দোকানী চতুর না হলে সেদিন বেচারা ভাসিলিয়ার কপালে অনেক দুঃখই ছিল বটে!

এবার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে একবার পড়াচ্ছিল ক্লাসে। চীনা ভাষায় চোখকে বলা হয়, 'ইয়েন চিং', আবার চশমাকেও বলা হয়, 'ইয়েন চিং'। তো ফারাক কোথায় এখানে? আমার একজন সহপাঠী বাক্য রচনা করল, "উও দ্য ইয়েন চিং শুয়াই হুয়াইল লা"। ক্লাস-টিচারতো হেসেই গড়াগড়ি যে, "কী? তোমার চোখ পড়ে ভেঙে গেছে?" ব্যাপারটা হল গিয়ে, চোখের যে চীনা পরিশব্দ 'ইয়েন চিং', 'চিং' অংশ-টিতে রয়েছে আলতো একটি মাত্রা আর চশমার 'ইয়েন চিং' এর 'চিং' অংশে রয়েছে চতুর্থ মাত্রা! আমার সহপাঠী বোঝাতে চেয়েছিল যে তার চশমা পড়ে ভেঙে গেছে। কিন্তু মাত্রা বিভ্রাটে পড়ে তার অর্থ দাঁড়িয়েছে যে, তার চোখটাই নাকি পড়ে ভেঙে গেছে!

আরও বলি। 'মাই' অর্থ নাকি কেনাকাটা; আবার 'মাই' অর্থ নাকি আবার বেচাবিক্রিও! কীভাবে সম্ভব? ওই যে মাত্রার খেলাধুলা! একটায় আছে তৃতীয় মাত্রা আর অন্যটায় চতুর্থ মাত্রা! মজার না? এরকম হাজারো উদাহরণ রয়েছে ভাষাটির ভেতরে।

মাত্রার একটুখানি এদিক ওদিক তারতম্যেই হয়ে যেতে পারে কোন খতরনাক পরিস্থিতির জন্ম! মাত্রা বিভ্রাট, উচ্চারণের নানারকম অদ্ভুতুড়ে নিয়মের এতরকম বালাই আছে বলেই না ভাষাটাকে অতটা খটমটে বলা যায় না, যতটা বাইরে থেকে আমরা ভেবে বসে থাকি আর কি! হ্যাপি লার্নিং!

লেখক - নুজহাত ফারহানা
চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি, ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয়
খুনমিং, ইউন্নান, চীন

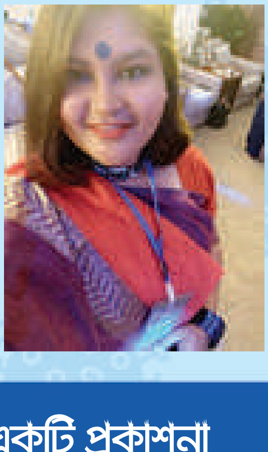

চীনের অভিজ্ঞতা

সময়টা ২০১৭, চীনে তখন সদ্য পা ফেলি। সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশে লালন করা স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আনন্দ যেমন ছিল, তদ্রুপ এতটা বছর পিতামাতার সান্নিধ্যে কাটানো আর মাতৃভূমি ছাড়ার কষ্টে বিষণ্ণতায় কাটছিলো প্রথম-প্রথম বেশ কয়েকটা দিন। এদিকে পেটপুজো দিতে হলে আশপাশটা ঘুরে বাজার-সদাই করতে হবে নিঃসন্দেহে। এরই লক্ষ্যে শুরু হয় দু'জন বন্ধু মিলে প্রায়শই চারপাশটা ঘুরা আরম্ভ।

হাঁটার পথে অসংখ্য ছোটখাটো দোকান থেকে উদ্ভট একটা গন্ধ নাকে এসে বিঁধতো। প্রথমে শুয়োর ফ্রাই-র গন্ধ মনে করে ভুল করলেও, পরে ইন্টারনেটে ঘেঁটে জানা গেলো শুয়োর রান্নার প্রসেসিং-এ ওরকম বিদঘুটে গন্ধ বেরোবার অবকাশ নেই।
যাইহোক, গন্ধ নিয়ে চলতে থাকে আরো বিস্তর বিশ্লেষণ। এদিকে বেশ কিছুদিন পর হঠাৎই একদিন জানতে পারি, ফার্মেন্টেড সয়াবিন কার্ড (চীনা ভাষায় **chòu dòufu**); সহজভাবে বলতে গেলে গন্ধযুক্ত টফু নামক চীনা জনপ্রিয় স্ন্যাকস, যা কিনা ভাজার সময় মূলত তীব্র এক গন্ধ ছড়ায়; কিন্তু খাবার হিসেবে জিনিসটি নাকি বেশ মুখরোচক।

তাছাড়া, খাবারটির সাথে জড়িয়ে থাকা পুরনো এক ইতিহাসের সন্ধান পেয়ে যাই। ঝু-ইউয়ানঝাং নামে একজন চীনা দরিদ্র ব্যক্তি যে কিনা পরবর্তীতে সেনা-পতি হন, তিনি এই খাবারটির উদ্ভাবক। একদিন ঝু-ইউয়ানঝাং বেশ ক্ষুধার্তাবস্থায় এক বাড়িতে থাকা বেশ কয়েকদিনের পুরানো ভাজা সয়াবিন কার্ড মুখে পুরে দিয়েছিলেন, যার সুস্বাদু স্বাদ তাকে বিমোহিত করে ফেলে।
পরবর্তীকালে তিনি সামরিক সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে সফলভাবে তাঁর সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিলে, আনহুই প্রদেশ বিজয় লাভ করে। বিজয় উদযাপন প্রাক্কালে তিনি পুরো সেনাবাহিনীকে "ছউ দফু" খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে শীঘ্রই খাবারটি পুরো চায়নাতে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে।
আবারো নিজ প্রসঙ্গে আসা যাক- মুসলিম বলে খাবারটির আদ্যোপান্ত সম্পর্কে স্টাডি করতে হলো এই মর্মে যে, পুরো প্রসেসে এ্যানিমল ফ্যাট বা এলকোহলের কোনোরূপ ব্যবহার হয় কিনা। কারণ, চীনাদের ক্ষেত্রে এমনকি শাক-সবজি রান্নার প্রসেসে বিয়ার কিংবা কুকিং-ওয়াইনের ব্যবহার খুব সাধারণ বিষয়। অবশেষে সকল সন্দেহকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফলাফল আমার অনুকূলে এলো।
জানা যায়, মূল প্রসেসে সয়া দুধের সাথে লবণ সহযোগে সয়াবিন কার্ড তৈরি করা হয়। এরপর সাইজমতো কেটে, ১ দিন ব্রাইনে চুবিয়ে রেখে তৈরি হয় ফার্মেন্টেড কার্ড। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ঠিক রেখে সয়াবিন কার্ড তৈরি বেশ ঝামেলা সাপেক্ষ বটে। ব্রাইনে চুবানোর ফলে সয়ার প্রোটিনগুলো প্রোটিজ এনজাইমের ক্রিয়ায় পচে যায়; এবং টফুতে থাকা সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড পুরোপুরি হাইড্রো-লাইজড হওয়ার ফলে এক ধরণের হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরি হয়, যা টফুর তীব্র গন্ধ সৃষ্টির পেছনে দায়ী। এরপর ভাজা হয় ডুবোতেলে, যার ফলে প্রোটিন ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়ে অন্যরকম এক সুস্বাদু স্বাদ তৈরি করে।
স্টিংকি টফু শুকনো অথবা স্যুপ সহযোগে খাওয়া হয়। শুকনোটি খাওয়া হয় ভাজার পরে অল্প মসলা সহযোগে। অপরদিকে সবচেয়ে মজাদার আইটেমটি বেশ ঝালযুক্ত সুস্বাদু স্যুপের সাথে তিলের তেল, বাদাম, রসুন পেস্ট ও ধনেপাতা সহযোগে খাওয়া হয়।
যাইহোক, সবকিছু জেনে খাবারটির স্বাদ নেয়ার ব্যাকুলতা চেপে বসলো ঘাড়ে। কিন্তু, মুশকিল এসে হাজির। আশেপাশে অহরহ মুসলিম রেস্টুরেন্ট থাকা স্বত্বেও, এমন কোনো মুসলিম খাবারের দোকানের খোঁজ পাওয়া গেলোনা যেটাতে টফু বিক্রি হয়। মূলত, অমুসলিম দোকানে শুয়োর খুবই কমন; যে পাত্রে শুয়োর রান্না হয়, ঠিক ওই পাত্রেই চলে অন্যান্য ডিস রান্না। তাছাড়া, পূর্ববর্তী ডিস এলকোহল সহযোগে রান্না হতেই পারে।

কিন্তু আমি বেশ নাছোড়বান্দা। খাবারের টেস্ট নেয়া চাই ই চাই। হঠাৎ মাথায় এলো, যদি এমন কোনো খাবারের দোকানের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে শুধুমাত্র টফু-ই বিক্রি করে, এতে করে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে পেয়েও গেলাম শেষমেশ। স্বামী-স্ত্রী মিলে ছোট্ট একটি দোকান চালান এবং সেখানে শুধুমাত্র টফু আর পরোটা বিক্রি হয়। তবুও, দোকানির কাছ থেকে এলকোহল এবং শুয়োরের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি আর আমাকে আশাহত করলেন না। অর্ডার দিলাম সবচেয়ে ছোট এবং কমদামি প্যাকটি। প্রথমে কিছুটা ইতস্তত বোধ করলেও, শেষমেশ মুখে পুরে দেই একপিস; সাথে সুস্বাদু স্যুপের এক চুমুক। সত্যিই স্বাদ টা আমার কাছে অসাধারণ লেগেছিল বৈকি।
আমি হলফ করে বলতে পারি, টফুর স্বাদ একবার গ্রহণ করলে এর প্রেমে পড়তে হবেই। আমি নিজে প্রায়শই টফু খাই; যে খাবারের গন্ধ একসময় আমাকে রাস্তার সাইড পাল্টাতে বাধ্য করতো।
একথা মনে করা হয় যে, শিশুদের মুখ্য ইন্দ্রীয় জিভ; পৃথিবীকে সে পরখ করতে চায় সম্ভবত জিভ দিয়ে, তাই হাতের কাছে কিছু পেলে তা মুখে পুরে স্বাদ নেয়। আপনি-আমি শিশু নই, তবে যাচাই-বাচাই করে স্বাদ নিতে বিপত্তি কোথায়!

লেখক - ইফতে খাইরুল হক ইমন
মেকানিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল প্রকৌশল
হনান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, হনান, চীন

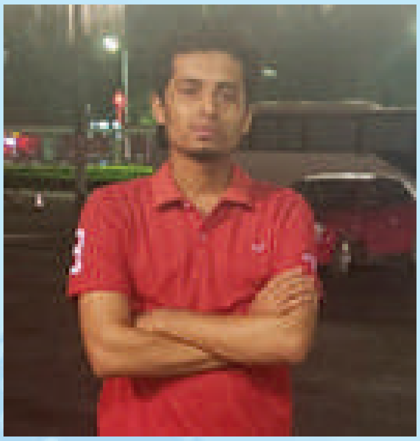

প্রথম চীনে আসার অভিজ্ঞতা

প্রথমবার চীনে আসার অভিজ্ঞতাটি বলার আগে আমি চায়নাতে আসার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বলে নিই একটুখানি। আমি কৃষক পরিবারের ছেলে। যখন ছোট ছিলাম, আমাদের জমিতে পানি সেচ দেওয়ার জন্য পাম্প কেনা হয়েছিল। পানির পাম্প যখন সেট করে জমিতে পানি সেচ দেওয়া শুরু করে, আমি তো সেটি দেখে অবাক। কী একটা দারুণ কারবার! কোথায় পাম্প আছে আর কোথায় নিয়ে পানি সেচ দিচ্ছে! আমার ধারণা ছিলো, এটি বাংলাদেশে তৈরি না। তাই আব্বুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন দেশ এটি তৈরি করেছে। উনি বললেন চীন, সাথে আরো চায়নিজ জিনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন থেকেই মাথায় ঢুকে গেল আমি বড় হয়ে চীন যাব। আব্বুকে বলে দিলাম আমি চীন যাব, ওরা কী সব আজব আজব জিনিস তৈরি করে।

চীন যাব, কিন্তু কীভাবে যাব, কী দিয়ে যাব, আজব আজব সব প্রশ্ন করে বসলাম। আব্বু বিরক্ত হয়ে বললেন, "বড় হয়ে যাইস"। মসজিদের ইমাম একদিন কী যেন আলোচনা করতে গিয়ে বললেন নবী করিম (সা:) নাকি বলেছেন, "তোমরা শিক্ষার জন্য দরকার হয় চীন দেশে যাও"। তখন আমায় ধরে কে? চীন আমাকে যেতেই হবে যেভাবেই হোক। সেভাবে নিজেকে তৈরি করেছিলাম। এইচএসসি পাশ করার পর সবাই যখন এডমিশন নিয়ে ব্যস্ত, আমি তখন কীভাবে অন্য দেশে যাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত। মাঝখানে একবার ইউরোপ-আমেরিকা তে কীভাবে যাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে একটু হাল্কা পাতলা স্টাডি করেছিলাম। কিন্তু সেখানকার টিউশন ফি এবং অন্যান্য খরচ আমাকে আশাহত করলো। সেগুলো বাদ দিয়ে চীনের পিছনে লাগলাম। তারপর ক'জন বন্ধুর সহযোগিতায় ফুল-ফ্রি স্কলারশীপ পেয়েও গেলাম।

অ্যাপ্লাই করলাম কয়েকটি ভার্সিটিতে। তার মধ্যে পজিটিভ বার্তা পেলাম দু'টি থেকে। সেখান থেকে একটি পছন্দ করলাম। তারপর ভার্সিটি থেকে কাগজপত্র পাঠানো হলো। আমিও যথাযথভাবে সব ঠিকঠাক ভাবে সামনে এগিয়ে গেলাম। ইউনাইটেড হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্হ্য পরীক্ষাটা করলাম। ওখানে গিয়ে দেখি অনেক চায়নিজ ঘোরাফেরা করছে এবং তারা নিজেদের মধ্যে চায়নিজে কীসব বলাবলি করছে। আমি আগে জানতাম না যে চায়নিজরা ইংরেজি কম ব্যবহার করে। আমি মনে করতাম বিদেশী মানেই ইংরেজিতে কথা বলে। সেখানে এক বড় ভাই এর কাছ থেকে চায়নিজরা ইংরেজি কম পারে এই মর্মে অনেক কথা শুনলাম যা অনেকাংশেই সত্য ছিলো না। উনি একটু বেশিই বলেছিলেন, যেগুলো শুনে একটু আশাহত হয়েছিলাম। কী আর করা? কিছুই করার নাই। ততদিনে অনেকটা পথ চলে এসেছি। বাংলাদেশে একটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেটাও ক্যান্সেল হয়ে গেছিলো।

মেডিকেল রির্পোট হাতে পাওয়ার পর এল অ্যাম্বাসিতে দাঁড়ানোর সময়।

কাগজ পত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ছুটলাম চায়নিজ অ্যাম্বাসির দিকে। এক বড় ভাই বলে দিয়েছিলেন একটু সকালে যেতে। আমি ভোরে উঠে চলে গিয়েছিলাম। উনি আরও বলেছিলেন হাল্কা পাতলা প্রস্তুতি নিতে। ভোরে চলে গিয়েছিলাম, তাই সিরিয়াল সবার আগে। ভোরে বলতে ভোর ৫:৩০ দিকে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম সকাল ১০ টা থেকে শুরু হবে ভাইভা। দশটা বাজলো, কিন্তু আমাকে ডাকা হলো না। ডাক পড়লো যারা বিজনেস ভিসা নিবেন, তাদের। এরপর ডাক পড়লো যারা সিএসসি স্কলারশিপে যাবেন। তারপর এলো আমার সিরিয়াল। ততক্ষণে আমি ভাইভার জন্য আর তৈরি নাই। অবস্হা খুব খারাপ। আমার যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমি ভিতরে ঢুকেই সামনে যিনি কাগজপত্র নিচ্ছেন, তার কাছে গিয়ে বললাম, **"Where is the toilet, please?"** তিনি দেখিয়ে দিলেন। টয়লেটে গিয়ে সব শেষে যখন পানি নিতে যাবো, দেখি পানির পাত্র নেই। আল্লাহ! এ দেখি শুধু টিস্যু পেপার দিয়ে রেখেছে? আমি মনে মনে বললাম, "এ কোথায় যাচ্ছি আমি?"

কী আর করা! নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে বের হলাম।

কাগজপত্র সব দেখালাম। কিছু প্রশ্ন করেছিলেন যার মোটামুটি, সবগুলোর উত্তর দিলাম। তারপর বললেন, নরমাল না আর্জেন্ট। আর্জেন্ট বলার পরে উনি বললেন, "কাল সকালে এসে ভিসা নিয়ে যেও"। আমি বললাম, **"May I go Now?"** উনি শুধু মাথা নাড়ালেন। পরের দিন গেলাম ভিসা নিতে। এবার ভিসা নিয়ে সোজা ঢাকা থেকে বাসায় চলে এলাম।

ভার্সিটিতে রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ছিল ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬। সেদিক খেয়াল রেখে টিকিট করেছিলাম সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখ। সব গুছিয়ে নিয়ে কোরবানির ঈদের দুইদিন পর ১৪ সেপ্টেম্বর বাসা থেকে বের হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। দুইদিন আগে এসেছিলাম, কারণ আরএমবি কেনা হয়নি তখনও। ঢাকায় এসে উত্তরায় গিয়ে আরএমবি এবং কিছু ডলার কিনলাম। তারপর ফাঁকা ঢাকাতে একটু ঘোরাফেরা করে নিলাম। ঈদের পর ছিল, তাই একটু ফাঁকা ছিল। ১৬ তারিখ ফ্লাইট ছিল দুপুর ২ টার সময়। তাই এয়ারপোর্টে সকাল ১১ টার মধ্যে চলে গেলাম। এয়ারপোর্টে তখন জীবনে প্রথমবার যাওয়া, একটু আধটু ভয় করছিল। আব্বুর সাথে কোলাকুলি করে তাঁকে সালাম দিয়ে আলাহর নাম নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভেতরে ঢুকে অনেকটা ভয় কেটে গেল। সেখানে আমার মতো আরো কয়েকজন বড় ভাইকে পেলাম। তাদের সাথে পরিচয়পর্ব সেরে, সবাই গেলাম লাগেজ বুকিং এবং টিকিট নিতে। সব ফর্মালিটি করে চেকিং এ গিয়ে আমার ব্যাগে স্কচটেপ আর একটি অ্যান্টি-কাটার পাওয়া গেল। সেগুলো রেখে দিয়ে ভালোমতো আরো কয়েকবার চেক করে ভেতরে ঢুকালেন। এখন অপেক্ষা উড়াল দেওয়ার। যেখানে এক বড় ভাই কিছু

ছবি তুলে দিলেন, তাই দিয়ে ফেসবুকে চেক ইন দিয়ে উঠে পড়লাম। বিমান ছেড়ে দিল, গন্তব্য কুয়াং চোউ। সেখানে ট্রানজিট ছিল ১৮ ঘন্টা। নেমে ইমিগ্রেশনে গিয়ে পড়লাম একটু ঝামেলায়। আমি যে সিটিতে যাব, তার নাম ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারছিলাম না, তাই ব্যাগ থেকে আবার সব কাগজপত্র বের করে দেখালাম। মেয়েটি একটু হেসে নিয়ে আমাকে উচ্চারণ শেখানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। পাসপোর্টে একটি সিল মারতে মারতে বললেন, **"Do not Worry. Few days later, everything will be ok."** আমি কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলাম, কারণ উত্তর দেওয়ার মুডে রাখেন নাই উনি। সব নিয়ে চলে গেলাম হোটেলে, যা আগে থেকেই বুক করা ছিল। হোটেলে গিয়ে গোসল করে নিলাম। বাসায় ফোন দিয়ে জানিয়ে দিলাম। সারাদিন কিছু খাই নাই। বিমানে খাবার দিয়েছিলো, কিন্তু খেতে পারি নাই। একটু খেয়েছিলাম, পরে টয়লেটে গিয়ে বমি করে দিয়েছি। খাবারের টোকেন নিয়ে গেলাম খেতে। আহা, একই অবস্হা! কিছু তো খেতেই পারলাম না, উল্টো আবার বমি করে দিলাম। বুঝলাম আমার খারাপ দিনের শুরু।
কী আর করা! ওখান থেকে বের হয়ে আশে পাশে খুঁজতে লাগলাম টং এর দোকান আছে কিনা! খোঁজাখুজির পর পেলাম এক সুপারশপ। সেখানে থেকে কিছু বিস্কুট এবং চিপস কিনে রুমে ফিরলাম। পানি গরম করলাম চা পান করার জন্য। চা পেলাম, কিন্তু চিনি নাই। জীবনের প্রথম চিনি ছাড়া চা পান করলাম। খারাপ ছিলো না। বিস্কুট চিপস নিয়ে বসলাম, এখানেও পরাজিত হলাম। পারলাম না খেতে। পানি পান করে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর ৫ টায় রুমে কলিং বেল এর আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল, কারণ সকাল ৯ টায় আমার ফ্লাইট ছিল কুয়াং চৌ থেকে নানচিং এ। হোটেলটি ছিল ফাইভ স্টার। জীবনের প্রথম ছিল ওই অভিজ্ঞতা। সিঙ্গেল রুম ছিল, পরে বুঝেছিলাম কেন ওয়ান ওয়ে টিকেট এর দাম ছিল ৩৮,০০০ টাকা। সকালে ঘুম থেকে ওঠে ব্রাশ করে সব গুছিয়ে নিয়ে হোটেলের গাড়িতে করে আবার এয়ারপোর্টে চলে এলাম। পেয়ে গেলাম এক বড় ভাইকে। উনি বলে দিলেন, কোথায় কী করতে হবে। উনি কোরিয়ায় যাচ্ছিলেন। সব ফর্মালিটি কমপ্লিট করে চলে গেলাম ওয়েইটিং রুমে। ও আলাহ! গিয়ে দেখি আমি শুধু একাই বিদেশী যাত্রী! বিমানে ওঠার পর কেমন যেন লাগছিল। এই দিকে কিছুই খেতে পারছিলাম না। অবস্হা খুব খারাপ, চোখ মুখ সব বন্ধ করে দিলাম ঘুম। বিমান ল্যান্ড করার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার পাশের জন আমার জন্য নাস্তা নিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সেগুলো দিয়ে দিলেন। এয়ারপোর্টে নেমে বাহিরে এসে দেখি এক চায়নিজ দম্পতি আমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নাকি ভার্সিটি থেকে পাঠানো হয়েছে। আমি তখনি যেতে চাইলাম। তারা যেটি বললো, সেটি শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তারা জানালো আমাকে তারা আজ হোটেলে রাখবে, পরেরদিন দুপুরে নিয়ে যাওয়া হবে ভার্সিটিতে, কারণ ভার্সিটি ওখান থেকে ২০০ কিমি দূরে। শুনে আমি হতভম্ব! জার্নি বা হোটেল কোনোটাতেই থাকার মত অবস্থা ছিল না আমার। এর মাঝে আমার এক বন্ধু আসলো। আমি তাদের বললাম, "আমি তাহলে কি আমার বন্ধুর সাথে যেতে পারি?" তাদের কাছে অনুমতি ছিলো না। আমার অবস্হা সব খুলে বলার পর, তারা কার সাথে যেন ফোনে কথা বললো। তারপর আমার পাসপোর্ট নিয়ে নিলো আর বললো কাল সকাল ১০ টার মধ্যে যেন চলে আসি এয়ারপোর্টে। আমি কীসের পাসর্পোট কীসের কী? আমার সব লাগেজ, পেপারস সব তাদেরকে দিয়ে দিলাম। তারপর আমার বন্ধুর ভার্সিটিতে গেলাম। যাওয়ার পর সেই ছেলেটি আবার আমাকে নিয়ে গেল ক্যান্টিনে। বলে ইন্ডিয়ান মুসলিম ফুড খেতে পারবো। পরে ওখানে গিয়ে কিছু ফ্রাইড রাইস খেলাম। মনে হলো যাক, অবশেষে মনে হয় বেঁচে ফিরলাম। এই দিকে তিনদিন হয়ে গিয়েছিল, শুধু পানি খেয়ে ছিলাম।

পরদিন সকালে উঠে নাস্তা করে গেলাম তাদের সাথে দেখা করতে। একটু অপেক্ষা করে তারা বাসে করে নিয়ে চললো ভার্সিটির দিকে। ঘণ্টা তিনেক বাসে থাকার পর পৌঁছলাম। ভার্সিটিতে আমরাই ছিলাম প্রথম বিদেশি স্টুডেন্ট, তাই খাতির-যত্ন একটু বেশি করেছিল মনে হয়। সব ফর্মালিটি শেষ, এখন ডর্মে যেতে হবে। কিন্তু সেখান থেকে ডর্ম ১.৫ কি মি দূরে। হাঁটার শক্তি নাই, আমি সহস করে বলে দিলাম এত দূর যাওয়া পসিবল না হেঁটে। তারপর কোথা থেকে ৫ জন আমার বয়েসি ছেলেপেলে এসে হাজির। কেউ ব্যাগ, কেউ লাগেজ, কেউ কাগজপত্র নিয়ে নিজেদের পিচ্চি ইলেক্ট্রিক বাইকে আমাকে তুলে নিয়ে চললো ডর্মের দিকে। আমার রুম ৫ তলায়। আলাহ! কীভাবে উঠবো? তারা বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা খারাপ। তাই তাদের মধ্যে কেউ একজন চলে গেলো ওয়েট করতে বলে। পরে ফিরে এল কিছু কলা, আপেল, কমলা, জুস নিয়ে। পরে রুমে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেলো। পরবর্তী আট দিনের মতো ভাত খেতে পারিনি। শুধু পানি, জুস আর ফলমূল খেয়েছিলাম। তারপর এই তো শেষ করে দিলাম চার বছর। এবং আরো যে কত বছর থাকবো, সেটা এখনো শিউর না। তবে চায়নার প্রেমে পড়ে গেছি আমি। বন্ধুবান্ধব যখন বলে যৌবনের প্রথম প্রেম কে ছিল, আমি কোন চিন্তা না করেই বলে দেই চায়না। কারণ চায়নাতে আসার স্বপ্ন দেখছিলাম সেই ছোট বেলা থেকেই। আছি চায়নাতে, দেখি আল্লাহ কতদিন রাখেন!

লেখক - মোঃ খাইরুল ইসলাম
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং
হুয়াইইন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
হুয়াই'আন, চিয়াংসু, চীন

পাহাড়ি অরণ্যে

সাঁঝবেলা আচমকাই পর্বতের উপড়ে ঝুপ করিয়া আসিয়া পড়ে, ইহা আমি সেদিন বুঝিয়াছিলাম। ছেলেবেলায় দাদি-নানির কাছে কতই না এইসব রূপকথার পর্বতের গল্প শুনিয়াছি, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আপনারা ইতিমধ্যে আমার গল্পের নাম শুনিয়া একটুখানি হইলেও আঁচ করিতে পারিয়াছেন যে, আমি এক অদ্ভুত জায়গার বর্ণনা দিতে চলিয়াছি। আজ্ঞে হ্যাঁ, ইহাই আমার বর্তমান ঠিকানা। তার আগে বলিয়া রাখা ভালো যে, আমি গ্রামের সেই শান্ত পুকুরে সাঁতার কাটিয়া বেড়ানো দুরন্ত বাঙালি কন্যে, যাহাকে গ্রীষ্মের সেই দাবদাহ দুপুরে ধরিয়া বাঁধিয়াও বাপ-মায়ে ঘুম পাড়াইতে পারিত না। রাত জাগিয়া হারিকেনের টিমটিমে আলোয় ভাইবোন লইয়া চিৎকার করিয়া পড়িতে হইতো। তা না হইলে মায়ের বকুনি আর উত্তম মধ্যম এর শেষ থাকিত না। সুযোগ পাইলেই প্রতিবেশির বরই গাছে ঢিল ছুঁড়িতে পিছপা হইতাম না, কখনও বা ভোর রাতে নিঃশব্দে উঠিয়া দল বাঁধিয়া আম কুড়াইতে যাওয়া ভুল হইতো না। আবার সকাল হইলে গাঁয়ের পথ ধরিয়া ইশকুলে যাওয়া, যেখানেই থাকো না কেন সাঁঝবেলায় মাগরিবের আজানের সাথে সাথে ঘরে ফিরিয়া আসা। মায়ের আদেশ অমান্য করিবার উপায় ছিলো না, একটুখানি দেরি হইলেই আমার নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া ডাক পাড়িত। যাহা সমস্ত গ্রামময় আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হইতো, সেই ডাক এখনও আমার কানে বাজিতে থাকে।

চিত্রঃ সবুজ চা উত্তোলনের মৌসুম

হয়তো সেই কারণেই একটুখানি হইলেও মানুষ হইতে পারিয়াছি। যাক গে, আসল কথায় আসা যাক। সেদিন প্রথম বেইজিংয়ের সেই কোলাহলমুখর বাঙালি পরিবেশের পড়াশুনার পাঠ চুকাইয়া এই অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ি চা বাগানের পথে রওনা দিয়াছিলাম। যখন টানা ছয় ঘণ্টার সফর শেষ করিয়া আমার গন্তব্যে পৌঁছাইলাম, তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হইতেছিলো। আমি আমার ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মন লইয়া একেলা এই নির্জন স্থানে দাঁড়াইয়া রইলাম। গেটম্যান খুব অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে চৈনিক ভাষায় কীসব আওড়াইতে লাগিল, তাহা আমার বোধগম্য হইলো না। শুনিয়াছি বেইজিং এ বসিয়া আমাদের এইচএসকে৩ লেভেল পর্যন্ত করানো হইয়াছিলো, ক্লাসে আমি সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। সেদিন বুঝিয়া ছিলাম যে, তাত্ত্বিক আর বাস্তবিকের মধ্যে তফাৎখানি কোথায়, তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমার যে চৈনিক বন্ধুটি আমায় স্টেশন হইতে লইয়া আসিয়াছিল, সে হঠাৎ করিয়া কোথায় যেন গায়েব হইয়া গেলো। আমিও বোকার মতন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রইলাম, নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হইয়াছিলো।

ও আসিবার আগে শুনিয়াছিলাম এ তল্লাটে কোন বাঙালি জাতির দেখা মিলিবে না। মনটা আরও শূন্যতায় ভরিয়া গেলো। কিছু সময় পর আমার সেই চৈনিক বন্ধুটির পুনরায় দেখা মিলিলো। এরই মধ্যে ক্ষুধায় আমার পেটের ভিতরে ছুঁচো দৌড়াইতে শুরু করিয়াছিল। আমার রুমের নিকটে পৌঁছানোর পরতো রীতিমত অবাক হইলাম। চারিদিকে শুধু ঘোর অন্ধকার, চোখে শুধু কয়েকটা টিমটিমে বাতি দেখিতে পাইলাম। ক্ষণিকের তরে মনে হইয়াছিল আমি কোন হাজার বছর ফেলিয়া রাখা জমিদার বাড়িতে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। অদ্ভুত এক অজানা ভয় সেদিন ভর করিয়াছিল। আমার চৈনিক বন্ধুটির ইংরেজি বিষয়ের উপর জ্ঞানের পরিধি কিঞ্চিৎ কম ছিলো, তাহা আমি পূর্বে থেকেই অবগত ছিলাম। যাহার কারণে এখনও অবধি তাহার মস্তকে আমার প্রহার যে কম হয় তা কিন্তু নহে। দরজার কপাট খুলিয়া যখন রুমের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, রীতিমত অবাক হইয়াছিলাম। একখানা চিকন জরাজীর্ণ খাটিয়া গুঁটিশুটি হইয়া পড়িয়া ছিলো, সাথে ছোট্টো একটি টেবিল। আলমারিখানাও যে মনমত হইয়াছিলো তা নয়। যদিও পরবর্তীতে আমার চিৎকার শুনিয়া সবকিছু প্রফেসার সাহেব কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমার এই প্রফেসর সাহেব আবার বেশ শান্তশিষ্ট মানুষ বটে, আমায় খুব ভালোবাসেন। আমি তাহার প্রথম বিদেশি ছাত্রী কিনা। যাহাই হোক, হঠাৎ করিয়া কোথা হইতে এক ভিনদেশী বড় ভাইয়ের সাথে দেখা হইলো। এই পাহাড়ি পিছলে পড়া রাস্তায় একটি বিশাল মোটর বাইক নিয়া হাজির হইলেন।

চিত্রঃ শীতকালে পর্বতারোহন (৩৫০মি)

তাহার বাড়িতে আমার আহারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে শুনিলাম। জাতিতে আমি মুসলমান, তাই খাওয়া-দাওয়াতে একটু বাছবিচার আছে প্রথম হইতেই। কোথা হইতে আমার চৈনিক বান্ধবী যে আমার জন্য কম্বল, বালিশ আনিয়া দিয়েছিলো সেই রাতে, তা আমি আজও জানিতে পারি নাই। যদিও আমি এত আগ বাড়াইয়া জানার চেষ্টা করি না। তারপর রুমখানি গুছাইয়া লইয়া যখন খাওয়ার জন্য বের হইয়াছিলাম, তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরের পরিবেশ দেখিয়া বুঝিবার জোঁ নাই যে, ইহা কী ধরণের পাহাড়। ভাইটি বলিয়াছিলো, নিশীথে যতই ভয়ংকর লাগিতেছে, দিনের আলোয় ততই সুন্দর লাগিবে। অগত্যা, তাহার কথা মানিয়া লইয়া খাওয়ার উদ্দেশে রওনা হইলাম। ভাইটি শুরুতেই বলিয়া দিয়াছিলো যে, তাহার স্ত্রী ইংরেজি জানে না, তাহার সাথে ইংরেজিতে কথা কওয়া যাইবে না। পড়িলাম মহাবিপদে, যদিও আমরা বাঙালিরা ভারতীয় ছবি দেখিতে দেখিতে বড় হইয়াছি, তাই খুব বেশি সম্যসা হওয়ার কথা ছিলো না। ভিনদেশে কেউ ভালো ইংরেজি বলিতে পারিলে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। ক্ষুধায় তখন চক্ষে কিছু দেখিনা, খেতে দিয়াছিলো দু'খানা শুকনা রুটি, মাছে-ভাতে বাঙালি, এই তীব্র ক্ষুধায় কি রুটি দিয়া পেট ভরিবে? কিছুই করিবার ছিলো না। চুপ করিয়া নিঃশব্দে গলধঃকরণ করিলাম। তারপর স্বল্প কিছু বাক্যবিনিময় শেষ করিয়া আমার রুমে আসিয়া ঘুম দিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলো পাখির কিচিরমিচির শব্দে। দরজার কপাট খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার নয়ন জুড়াইয়া গেলো। মনে মনে ভয় ও লাগিলো, এই নির্জন পাহাড়ি চাবাগানে আমি কী করিয়া থাকিবো! সামনে বিশাল পর্বতের চূড়া, আমার ঘরটি একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে, উপরের দিকে সিঁড়ি বাইয়া উঠিয়া গেলে আরও অনেকগুলো সুন্দর বিল্ডিং এর দেখা মিলিবে। তখনি বুঝিলাম গত রাতে যে টিমটিমে আলো জ্বলছিলো, তা এই সিঁড়িতে ছিলো। না ইহাকে ঠিক ডরমিটরি বলা চলিবে না, বাংলো ধাঁচের ঘর বলিতে পারেন। হাঁটুসমান সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে সরু হাঁসের নাড়ীর মত রাস্তাগুলো একেঁবেঁকে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যত দুর চোখ যায় শুধু চায়ের বাগান, দেখিলে বুকের মধ্যে হাহাকার করিয়া ওঠে। এখানে প্রকৃতি তার সমস্ত সবুজ ঢালিয়া রং ছড়াইয়া যেন অনন্তকাল ধরিয়া বসিয়া রইয়াছে। তাহার ঠিক দুই দিন পর আমাকে ল্যাবে লইয়া যাওয় হইলো। ভাবিয়াছিলাম, এমন একখানা গহিন অরণ্যে কথা বলিতে কষ্ট হইবে। কিন্তু না, তেমনটা হয় নাই। আমার সহকারী প্রফেসর টানা চার বছর **UK** থেকে পড়াশোনা শেষ করিয়া সদ্য যোগ দিয়াছেন। দুই একজন ল্যাবমেটও বেশ ভালো ইংরেজি বলিতে পারে। যাক, অবশেষে শান্তি পাইলাম। বুঝিলাম, আগামী তিন বছর এই অচেনা, অজানা মানুষগুলোর সাথে আমার থাকিতে হইবে, ইহারাই আমার এখন হইতে আপনজন।

চিত্রঃ শীতকালে পর্বতারোহন (৩৫০মি)

যখন বিকাল গড়াইয়া গোধূলী আসে, তখন চারপাশটা কেমন খালি হইয়া যায়। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যকে কালো চাদরে মুড়াইয়া ফেলে, ঠিক যেন সেই গ্রামের বটগাছের ছায়াতলে সাঁঝ নামিবার সাথে সাথে মেলা হইয়া যায়। চারিদিকে নিস্তব্ধতা ঘিরিয়া ফেলিতে থাকে। শুরুতে খানিক খারাপ লাগিত, ধীরে ধীরে সব কিছু মানিয়া লইলাম। আসলে একাকিত্ব হইল মনের ব্যাপার, যদি ভাবো পৃথিবীতে তুমি একা আসিয়াছো, একা যাইতে হইবে, তাহা হইলে আর ভয় কাজ করিবে না। পাহাড়ের মন বোঝা বড় দায়, গনগনে প্রখর রৌদ্র শেষে ঝুপঝাপ বৃষ্টি নামিয়া আসে। রাতে কনকনে ঠাণ্ডা, দিনে আবার গনগনে সূর্য। আর চা বাগানের কথা নাই বা বলিলাম, এখনি সন্ধ্যা নামিবে, ইহার গল্প অন্য একদিন বলিবো। বাতিগুলা প্রতিদিনের মত আজও জ্বলিয়া উঠিবে। সামনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা পর্বতখানা তাহার সব অহংকার ভুলিয়া গিয়া প্রতিদিনের মত আঁধারে বিলীন হইয়া যাইবে। শুনিয়াছি সেথায় পঞ্চমাথাওয়ালা সর্পের দেখা মেলে, সেই ভয়েতে কেউ পর্বতে ওঠে না। প্রতি প্রাতেঃ কেউ একজন আসিয়া ঘরের সামনে হলুদ রংয়ের পাউডার দিয়া যায়, সর্প হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য। আমার বোধ হয় কী জানেন? সকলকেই জীবনে একবার হইলেও পাহাড়ের কাছে যাওয়া উচিৎ, তাহা হইলে নিজেকে অনেক তুচ্ছ মনে হইবে। মানুষের সব দাম্ভিকতা দূর হইয়া যাইবে।

শিরিন আক্তার
পিএইচডি গবেষক
চা গবেষণা ইন্সটিটিউট, চাইনিজ একাডেমি অব অ্যাগ্রিকালচারাল সায়েন্স
সি হু, হাংচোউ, চচিয়াং, চীন

পাললিক অভিপ্রায়

ইচ্ছে করেই রটিয়ে দিয়েছি
প্রিয় কলঙ্কগুলো-
যা প্রাপ্তি, পূণ্য কিংবা পাপ
নিন্দুকের কর্মপ্রয়াস ফিরিয়ে দিয়েছি।

গৌণ খ্যাতি কিংবা অভিশাপ
আপেক্ষিক বিবেচনার প্রামাণ্যচিত্র;
আচানক একদিন হারিয়ে যাবে
অনাগত কৃষ্ণ-গহ্বরে।

শুদ্ধতার অনলে পুড়ে মনুষ্য
তুমি মানবিক হও
আরো মানবিক...

কবি - গোলাম সরোয়ার
হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ

মহামারী করোনা

তাহরিমা আলম কেয়া

আজ বিশ্বব্যাপী এসেছে করোনা
ভাইরাস নাম নিয়ে,
করতে দূর বিভেদ-বৈষম্য
মহামারী রূপ দিয়ে!
হানাহানি আর মারামারি সব
বিত্তশালীর ঠুনকো অহংকার,
আমি দেখি আজ সব ভুলে তারা
করেছে বন্ধ, নিষ্ঠুর-অনাচার!
গেঁথে দাও সব সীমানা প্রাচীর
খুলে দাও ফারাক্কা বাঁধ,
এসব নিয়েও নেই মাথা ব্যথা
নেই হৈ-চৈ, ইচ্ছে জটিল সাধ!
বড় বড় সব অট্টালিকা
পাহাড় সমান প্রাসাদ,
সব রাজ্যের রাজা, জ্ঞানী-গুণী
একই চিন্তায় গুণছে দিন প্রমাদ!
এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া আর
আফ্রিকা, আমেরিকা,
একই মালিকের আওতায় জীবন
জ্বলছে, নিভছে - হচ্ছে যবনিকা!
ধর্ম, বর্ণ সকল জাতির
ছড়ানো মানুষের এই বিশ্ব,
সর্বনাশা-নামধারী মুকুট, মাথায় বসে
করছে জীবন নিঃস্ব!
অস্ত্র ছাড়া, যুদ্ধ ছাড়াই
সব দেশ আজ নিজ গৃহে -- গৃহবন্দী,
নিজেদের মনে আতংক বিরাজ
নিয়তই তার সাথে করে চলেছি সন্ধি!
খোদা বুঝি আজ দিয়েছেন ইঙ্গিত --
প্রতিদিন প্রাণহানির ভয়াবহ এই দৃশ্য,
থমকে যাওয়া যান্ত্রিক জীবনে এই করুণ মৃত্যু--
কতই না বীভৎস!!
হে মানবজাতি, ফেলে দাও অস্ত্র,
যুদ্ধ নয় মানুষে মানুষে, বেছে নাও মনুষ্যত্ব,
যুদ্ধ করো মানব কল্যাণে --
এক হয়ে সব করোনাকে করো ধ্বংস!!!!
সব শেষে আমি মিনতি করি----
হে মহান আল্লাহ! হে রাব্বুল আলামিন
হে রহিম রহমান-----
তুমিই আমাদের ক্ষমা করো প্রভু --
দয়া করো প্রভু, ভিক্ষা দাও ----
আমাদের মানব জাতির প্রাণ!!!
-আল্লাহ হাফেজ

কবি - তাহরিমা আলম কেয়া
রাত পৌনে ৪ টা
২৩ শে মার্চ ২০২০
মধ্যপীরের বাগ, ঢাকা

একটি পত্র কবিতা

মেহ্-রিয়াম বর্ষা
মোঃ আসাদুজ্জামান

প্রিয় মেহ্-রিয়াম বর্ষা,
আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি,
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে,
তোমার একশো আটানব্বইটি কল উঠে আছে!
তারপর ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে,
একরাশ অভিমান নিয়ে আধো আধো
বাংলা, হিন্দি, উর্দু আর ইংরেজি মিশিয়ে,
তুমি বলেছো, ছিলাম নদীর তীরে,
সুউচ্চ পর্বতে ঘেরা নয়নাভিরাম প্রকৃতির
অবারিত সবুজের মাঝেই,
এক জাঁকজমক পূর্ণ "বাংলাদেশ" নামক
লোকালয়ের কোনো এক নির্জন কোণে,
হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা,
একগুচ্ছ অভিমান নিয়ে বসে আছো,
আমার অবুঝ প্রিয়তমা হয়ে।

দুঃখিত, আমি দুঃখিত!
আমার অপারগতা,
নিশঃঙ্কচিত্তে স্বীকার করছি। আজ বসন্ত,
সেদিনের সেই শুভক্ষণটিও ছিল বসন্তের প্রথম প্রহর,
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে
কোনো এক প্রোগ্রামে,
সুদূর চীন থেকে বাংলায় এসেছিলে,
অতিথি পাখি হয়ে!

হঠাৎ কী যে হলো আমার!
এক পলকেই বাইতে শিখেছিল,
মন প্রেমের তরী,
আর সুযোগ বুঝে তাল দিয়েছিল বসন্তের কোকিল!
বৃষ্টি তোমার খুবই পছন্দ,
রিম ঝিম বৃষ্টিতে নূপুর পায়ে,
নেচে নেচে গান গাইতে,
তোমার খুবই ভাল লাগে।
তাই তোমার নাম দিয়েছিলাম বর্ষা,
তারপর ভীষণ আবেগে আপ্লুত হয়ে,
টেক্সট করেছিলে তুমি মেহ্-রিয়াম বর্ষা।
হ্যাঁ হ্যাঁ না না সিদ্ধান্তহীনতা,
ব্যাস শুরু হল নিরবতা!
ভাঙ্গতে যে কত চড়াই উৎরাই পার করতে হয়েছে,
নিশ্চয় মনে আছে তোমার,
প্রাণের প্রিয়া মেহ্-রিয়াম বর্ষা?

কথা ছিল, তোমার কম্পিউটার সাইন্সের,
সপ্তম সেমিস্টার শেষ হলেই,
আমি সাংহাইতে আসবো।
আমাদের এ স্বর্গীয় প্রণয়ে,
দীর্ঘ সময় ধরে জমে থাকা,
অদেখা আকুতি অনুভূতি ভালোবাসা ও
হৃদয়ে হৃদয়ে লেনা-দেনার
কাঙ্ক্ষিত তৃষ্ণা মেটাবো,
অন্তরের অন্তস্হলে নিহিত,
অদৃশ্য অথচ অস্থির অনুভূতি সম্পন্ন,
বকেয়া হিসেবের পাঠ চুকাবো।

কিন্তু বিধি বাম!
করোনা ভাইরাসের আক্রমণে,
চীনসহ গোটা পৃথিবী ব্যাপী যেন মৃত্যুপুরী,
আতঙ্কিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত!
তাই পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করতে,
সরকার, এয়ারপোর্ট, ইমিগ্রেশন কর্তৃক,
নিশ্ছিদ্র সতর্কতা জারি,
ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
তুমি কাশ্মীরে না গিয়ে,
বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলে,
এই অল্প সময়ে খানিকটা,
বাংলাও শিখে ফেলেছ কিন্তু,
আমি না করায় তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছো!
যা তোমার তুর্কি রুমমেট,
কমল শাহিদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত!
তোমার আধো আধো কণ্ঠের বাংলা,
শুনতে পেয়ে, আমি খুব খুব খুবই খুশি হয়েছি।
তুমি হয়তো জানো,
তার পরেও বলছি, এই ভাষার জন্য,
জীবন দিয়েছে কত শত প্রাণ!
পৃথিবীর বুকে,
মাঝখানে যে লাল বৃত্ত আঁকা সবুজ,
নিশান উড়তে দেখ,
তা আমারি ভাইদের রক্তের বিনিময়ে,
অর্জিত স্বাধীন বাংলা।

আমি, আমার অবলা বেলা,
এককী বিকেল ও চারিপাশটার আনাচে কানাচ,
সারাক্ষণ শুধুই তোমায় খুঁজে ফেরে,
সবকিছু ঠিক থাকলেও মনে হচ্ছে,
কীসের যেন শূন্যতা, অস্থিরতা, ব্যাকুলতা!
ঠিক তুমি যেমনটি বলেছো এবং লিখেছো।

সময়োপযোগী মননশীলতা ও
উদ্ভাবনী চিন্তায় এখনো আমি খুবই দরিদ্র।
উত্তরণে আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে,
নিবেদন করতেও রয়েছে,
মনস্তাত্ত্বিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা।

আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত!
তুমি বিহনে এ ক্লান্ত শরীরে,
প্রিয় ঘুম যখন ভর করে,
দুচোখের পাতা জুড়ে তখন,
স্বপ্ন আর কল্পনা মিশ্রণে,
অলস মস্তিষ্কে খেলা করে,
ভালোবাসার উন্মাদ শিহরণ!
এ যেন এক স্বর্গীয় অনাবিল আনন্দ!
তোমার ও কি এমন হয়!

মেঘের খামে রোদের ঠিকানায়,
ভাসিয়ে দিলাম আমার ভালোবাসা।
পাগলী ম্যাম ক্ষমা কর মোর অপারগতা,
গ্রহণ কর আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা
ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা।
ইতি টানলাম
নিশাত, তোমারি ভালোবাসা।

কবি- মোঃ আসাদুজ্জামান
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

তোমার খোঁজে

রায়হান তানভীর

আকাশকে বলি,
ও আকাশ,
তুমি কি আজ দেখেছ
আমার প্রিয় মানুষটিকে?
আকাশ মৃদু হেসে বলে,
নাগো না!
তাকে যে আজ দেখিনি ধরণীতলে।
চাঁদকে বলি,
চাঁদমামা,
তুমি কি আজ তোমার জোছনাধারায়
ভিজিয়েছো আমার মনোহারিণীকে?
চাঁদ অবাক হয়ে বলে,
আমি আজ জোছনা ছড়িয়েছি
তাকে ভেজাব বলে,
কিন্তু!
সেতো আজ আসেনি
সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে।
পাহাড়কে বলি,
ও পাহাড়শৃঙ্গ,
তুমি কি আজ শুনেছ
তোমার বুকে আমার প্রিয়তমার প্রতিধ্বনি?
পাহাড় বিষন্ন মনে বলে,
আমি শুনেছি কত সহস্র প্রতিধ্বনি,
কিন্তু!
সেই চিরপরিচিত প্রতিধ্বনি
তো আমি আজ শুনিনি।
বৃক্ষকে বলি,
ও বৃক্ষরাজি,
তুমি কি আজ তোমার ছায়ায়
সুশীতল করেছ আমার নীলপরীকে?
বৃক্ষ জবাবে বলে,
আমিতো দেখিনি তোমার প্রিয়াকে
আজ আমার সুশীতল ছায়াতে।
সাগরকে বলি,
ও জলধারা,
তুমি কি আজ দেখেছ
তোমার জলধারায় স্নান করতে
আমার প্রেয়সীকে?
বিষণ্ন চিত্তে জলধারা বলে,
আমি দেখেছি অনেককে আজ আমার বুকেতে,
কই!
দেখিনি তো তোমার প্রিয়তমাকে।
হতাশ হয়ে একা বসে আছি আমি আনমনে।
হঠাৎ
মন আমায় ডেকে হাসিয়া বলে,
এই বোকা ছেলে,
কেন তুমি বসে আছো আনমনে?
জগতের কেউ তাকে আজ দেখেনি,
কারণ সে ছিল আমারই সনে।
তোমারই অন্তরালে, তোমার হৃদয়জুড়ে।
প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি সময় ধরে।
তোমারই প্রিয় মানুষ হয়ে।

কবি - রায়হান তানভীর
প্রভাষক
স্কুল অব মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
ইস্ট চায়না ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি
নানছাং, চিয়াংসি, চীন

পুনরুদ্ধার

শুকাতে শুকাতে ফেঁটে চৌচির হতে চাও
আকাশ তোমাকে বারবার বাঁচিয়ে দিয়ে যাবে
উত্তপ্ত আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে চাও
কোমল শীতল স্পর্শে তুমি নবরূপা হয়ে যাবে
বিষাক্ত শরীরে অন্ধকারে ডুবে যেতে চাও
সূর্যোদয়ের প্রতাপে তুমি শুদ্ধতায় জেগে উঠবে
ধু ধু প্রান্তরে চিৎকার করে কাঁদতে চাও
রংধনুর হাসিতে তুমি আচ্ছন্ন হয়ে যাবে
একটি গোধূলির উন্মাদনাকে উপেক্ষা করতে চাও
সমস্ত উচ্ছ্বাস তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে
রাতের নির্জনতায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাও
জ্যোৎস্নার আলোয় তুমি উদ্ভাসিত হয়ে যাবে ।

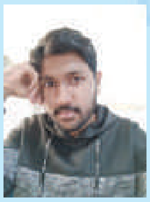

কবি - রাফী উর রহমান
শানতোং বিশ্ববিদ্যালয়, চিনান, চীন

সেদিন
মাঈন উদ্দিন

সেদিন শ্রী-বিভূষণ হারিয়ে আমি হয়ে যাবো কুশ্রী
চামড়া কুঁচকে গিয়ে রুক্ষ মরুতে থাকবেনা আমার যৌবনশ্রী
শোভাকেশ হারিয়ে সেদিন মাথায় পড়বে টাক
চিক্কণ নিভাঁজ দেহে সেদিন প্রৌঢ় পোশাক
সেদিন থাকবেনা সতেজ চোখের প্রেমী অমিততেজ
সেদিন এই আমিরে মাটি টেনে নিবে বয়োবৃদ্ধির লেজ
ব্যামোতে শুয়ে সেদিন আমি অসাড়, কেবল স্মৃতিচারণ
প্রৌঢ় নিবারণে সেদিন আমার কেবল ব্যর্থ মন্ত্রোচ্চারণ
সেদিন পাকা কেশে আমার পারু চাহনি
পীতাব লোচনে নাজানি কেমন দেখাবে এই জীবনখানি
সেদিন থামবেনা এই বিশ্বের প্রসার, তুমি হইয়োনা অধীর
আমি চলে যাবো ওপার কবরে ফেলে শরীর
সেদিন কী তুমি আমার থাকবে, তোমার প্রীতম তরে?
সেদিন যদি আমি পরে যাই মৃত্যুর ধারে তুমি কী আসবে আমার কবর কিনারে?
সেদিন কী তুমি আমার তরে বেঁচে থাকবে?
মহা-হাশরে আমায় পাওয়ার মিনতি করবে?
সেদিন চির-অমর হয়ে আমি তোমার পাশে রবো
সেদিন আবার এই আমি যুবা হয়ে তোমার হাত ধরবো
স্থিরায়ুর স্বর্গে ৩৩ বছরের এক নবউত্থিত যুবা
আমি, আমিই সেই মর্তবাসী তোমার প্রেমী ধ্রুবা
মর্ত্যের সুরে সেদিনের চিরায়মানা ভালোবাসা
সেদিন কী তুমি আমার হবে, এই অন্তিম জিজ্ঞাসা।

কবি - মাইন উদ্দিন
অ্যারোনটিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং
শেনইয়াং অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি
শেনইয়াং, লিয়াওনিং, চীন

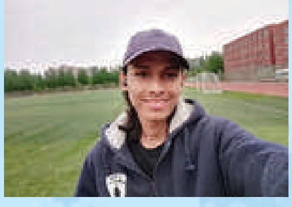

তৃপ্তির দীপ্তি

আবু সাঈদ

ভালোবাসি আছে যত পর্বত
আর ভালোবাসি উজ্জ্বল সূর্যালোক।
ভালোবাসি রাতে আকাশের তারা
নিশিতে নৌকায় যাত্রা।

ভালোবাসি সমগ্র পৃথিবীকে
হাওয়ায় ভেসে ভেসে
সুউচ্চ স্থানে অবতরণ
যেখান থেকে তাকালে জুড়ায় নয়ন।

ভালোবাসি অনাগত ভবিষ্যত
হাতছানি দেয় যা
শিক্ষানবিশদের কাজের মারফত
আর ভালোবাসি মানবজাতির মহাশূন্যে পাড়ি।

ভালোবাসি পুরো ধরণীকে
কোমর অবধি জলাশয়ে গা ভাসাতে
এমন জায়গায় যেখানে আগে যাইনি!

চরে কোন এক সুউচ্চ পর্বত চূড়ায়
ভালোবাসি তাকাতে মসৃণ আকাশ সীমায়।

ভালোবাসি বড় বড় শ্বেত সামুদ্রিক হাঁস
সাদা হাঙর যখন লাফিয়ে করতে চায় গ্রাস
আর ভালোবাসি মহাসমুদ্রে জেগে উঠা দ্বীপ।

ভালোবাসি এই গ্রহটাকে
দাঁড়িয়ে কোন এক সমুদ্রতটে
ভিনগ্রহে ঝরে পড়া উল্কাপাতের মতো
ভালোবাসি একে অনুসরণ করতে।

ভালোবাসি সারা বসুন্ধরা
এটা এমনই এক শান্তিধারা
"এ ভুবন সত্যি অসাধারণ।"

কবি - আবু সাঈদ
শিক্ষার্থী, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অটোমেশন, ২য় বর্ষ
ছাংশা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ছাংশা, হুনান, চীন।

শেষ আকুতি

মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম

আমি তেজী যুবক বয়স ছাব্বিশ মাত্র
যেনো তেনো রোগে কাবু হবার নই যে আমি পাত্র।
নিরোগ সতেজ ছিলাম তরতাজা,
কভু ভাবিনি এত করুণ হবে মোর সাজা।
ষোলো দিন আগে হলো একটু জ্বর,
সাধারণ ফ্লু ভেবে চুপচাপ ছিলাম দিনটা ভর;
পনেরো দিন আগে শরীর ব্যথা যখন,
চট করে পেইন কিলার খেলাম তখন।
চৌদ্দ দিনের কালে জ্বর, শরীর ব্যথা ছিল ,
পেইন কিলারেই থেকে যাই মন সাড়া যে দিল।
বলছি তেরো দিন আগের কথা,
আজগুবি ব্যাপার গলাতেই যে সব ব্যথা।
বারো দিনের কালে জ্বর, কাশি, ব্যাথা গলে আমার,
পরীক্ষা করাতে যেয়ে হলাম সোচ্চার;
কোভিড-১৯ পজিটিভ হলো এগারো দিনের যখন শেষ,
ঘ্রাণ ও স্বাদ হারালাম এই রোগের চরম রেশ।
দশম দিনে কর্ণ গলার ব্যথায় হলাম কাত,
জ্বর দেহে গন্ধ নেই, স্বাদ নেই, পারি নাই খেতে ভাত;
সব উপসর্গ দিল দেখা নবম দিনের কালে ,
শ্বাসকষ্ট এতটাই কি ছিলো মোর ভালে।
অষ্টম, সপ্তম দিনও গেলো আমার;
শ্বাস যন্ত্রণায় কাতর ছিলাম বারেবার।
ছয় দিনের বেলায় ঘর থেকে বের করে ওরা,
পুলিশ আর স্বাস্থ্যকর্মী অ্যাম্বুলেন্সে নিতে হয় পাগলপারা।
অসহায় মা-বাবার করুণ সে চিৎকার ,
ভাই-বোন শোকে মুজ্জমান ছিল যে নির্বিকার।
লকডাউনে শূন্য হয়েছিলো মোর বাড়ি,
মা চিৎকার দিলো কলিজারে তুই যাবি কই মোরে ছাড়ি।
অ্যাম্বুলেন্স এলো কতই না সাইরেন দিয়ে,
বুঝেছিলাম ওরা ঠিকই আমায় যাবে নিয়ে।
শ্বাস যন্ত্রণায় গাড়িতে শুয়েছিলাম,
অ্যাম্বুলেন্সের ছোট জানালা দিয়ে অবাক নয়নে দেখলাম।
বিদায় পথে অশ্রুশিক্ত মা আমার রইল শুয়ে,
দু-হাতে মাথাটা চেপে বাবা দু-হাটু ধুলায় গেঁথে পড়েছিলো নুয়ে।

আমার কাছে পৌছাবে তাই ছুটেছিলো ছোট ভাই ,
ঘরের মেঝেতে বোনও অচেতন পড়ছিলো যে তাই।
আমি শেষ দেখা দেখেছিলাম আজন্ম প্রিয় মানুষগুলোকে,
জানতাম এর চাইতে প্রিয় মানুষ নাই আমার এই ভূলোকে।
ছয়টা দিন বেঁচে ছিলাম কতই না পথ্য খেয়ে,
মিরাকেল হত যদি সেরে উঠতাম পরাজিত এই শরীর নিয়ে।
ডাক্তার এর চোখ দেখে বুঝেছি মারা যেতে হবে ,
জন্মভূমি, এই পৃথিবী, প্রিয় মায়ের বুক আমি শূন্য রবে;
জানি আমার লাশটাকে ছুঁতে পারবে না পরিজন কভু,
শেষ আকুতি এমন মৃত্যু দিও না কাউকে প্রভু।
জানাযায় পাঁচ পুলিশ হবে ন্যস্ত,
জানি দাফনে হবে চার জন ব্যতিব্যস্ত;
মা নিষিদ্ধ, বাবা নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ বোন ও ভাই,
লাশের পাশে তাইতো আজ কোন প্রিয়জন নাই;
আমি শাহরিয়ার বলিষ্ঠ যুবক ছিলাম,
করোনা ভাইরাসে আমি আজ হেরে গেলাম।
প্রিয় পৃথিবী বেঁচে থাকো হয়ে শান্ত,
হাসপাতালের বিছানা হতে বলছি মানব সকল হবে না বিভ্রান্ত।
আঠারো দিন আগে মায়ের নিষেধ গ্রাহ্য করি নাই,
ঘর থেকে বেরিয়ে করোনা দিলাম এই শরীরে ঠাঁই।
জানিনা এই ব্যধিতে আমার দ্বারা,
সংক্রমিত হলো বাবা-মা, ভাই-বোন আর কে বা কারা;
মানুষ ঘরে থাকো, ভালো হোক তোমাদের নিয়তি,
সচেতন হও সুস্থ থাকো এই মোর শেষ আকুতি।

কবি -মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম
কুইচৌ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি
কুইইয়াং, কুইচৌ, চীন

রেসিপিঃ চাইনিজ চিলি চিকেন

চীন রন্ধনশৈলীতে তার পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। গুণে-মানে চীনা খাবারের কদর বিশ্বজুড়ে। চীনা অনেক খাবার যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি সুস্বাদুও। ফলে চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে ভোজনবিলাসীদের কদর রয়েছে সব সময়ই। তেমনই একটি মুখরোচক চীনা খাবার হচ্ছে চাইনিজ চিলি চিকেন। এটি হাক্কা চীনা ঐতিহ্যের একটি মাংসের তরকারি। এটাকে হাড় ছাড়া চিলি চিকেন ফ্রাই নামেও ডাকা হয়। তবে হাড়সহ ও অনেকে রান্না করে। মসলা এবং কষানোর ভিত্তিতে চিলি চিকেন রেসিপিতে তারতম্য দেখা যায়। চাইনিজ এই রেসিপি রান্না করা বেশ সহজ। এমনকি এটি রাঁধার প্রণালী আমাদের দেশীয় মাংস রান্নার মতো এতো সময়সাপেক্ষও না। রান্নার প্রক্রিয়া জানা থাকলে বাড়িতে খাবারটি বানিয়ে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবকে চমকে দেয়া যায়। খুবই অল্প সময়ে এই রেসিপি তৈরি করা সম্ভব। ভাত ছাড়াও এই রেসিপি পরোটা, তান্দুরি বা খিচুড়ি দিয়েও খাওয়া যায়। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক “চাইনিজ চিলি চিকেন” রেসিপিটি।

উপকরণ

১/ মুরগী (১ কেজি, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কাটা)
২/ শুকনো মরিচ অর্ধেক ভাঙ্গা ১০-১২ টা
৩/ ০১ বাটি পেঁয়াজ (বড় কুঁচি করে কাটা)
৪/ আদা ও রসুন ১/২ বাটি
৫/ সয়াসস ০২ টেবিল চামচ
৬/ তেল (পরিমাণ মত)
৭/ লবণ (পরিমাণ মত)
৮/ ১/২ চা চামচ ভিনেগার

রন্ধন প্রণালী

প্রথমত, প্যানে তেল গরম করার পরে আদা দিতে হবে, তার পরপরই মুরগি দিতে হবে। এভাবে কড়া আঁচে ১ মিনিট ভাজতে হবে। এরপর পরিমাণ মতো লবণ, ভিনেগার এবং পানি দিয়ে ১ থেকে ১.৫ মিনিটের জন্য ঢেকে দিতে হবে। তারপর রসুন, সয়াসস এবং সর্বশেষে মরিচ ও পেঁয়াজ কুঁচি দিয়ে ১ মিনিট ভেজে নিতে হবে। এরপর পরিবেশন করতে হবে। চাইলে ডেকোরেশনের জন্য উপরে হালকা পেঁয়াজ এর কাটা ফুল ব্যবহার করতে পারেন।

লেখা - সাকিব রেজা পিয়াল
মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২য় বর্ষ
ছাংশা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ছাংশা, চীন

ঐতিহ্যবাহী যোং যি পিঠা

চীনা রন্ধনশৈলী পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বহুল সমাদৃত রন্ধনশৈলীর মধ্যে অন্যতম। চীনের খাদ্যসংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে রয়েছে কয়েক হাজার বছরের ঐতিহ্য। তেমনি একটি ঐতিহ্যবাহী চীনা খাবার হচ্ছে যোং যি। চীনা চন্দ্রবর্ষের পঞ্চম মাসের ৫ তারিখে উদযাপিত ড্রাগনবোট ফেস্টিভ্যালে যোং যি খাওয়া একটি ঐতিহ্য, যা একজন বিখ্যাত চীনা কবি চু ইউয়েনের মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখার সাথে জড়িত।

ঐতিহ্যগতভাবে ভিতরে ভুট্টা, কলা, ইত্যাদি পূরে বাঁশপাতা, পদ্মপাতা দিয়ে আঠালো চাল মুড়িয়ে যোং যি বানানো হয়। যোং যি ভাঁপে বা সেদ্ধ করে তৈরি করা হয়। পশ্চিমা বিশ্বে এই মিষ্টান্নকে ডাম্পলিং বা আঠালো চালের ডাম্পলিং নামে ডাকা হয়। অঞ্চলভেদে যোং যির আকার-আকৃতিতে ভিন্নতা থাকলেও কোণ আকৃতির যোং যি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। আবার চালের ভিতর পূর হিসেবে মাংস (হাঁস, মুরগি), ডাল, মাশরুম, বাদাম এসবও ব্যবহার করা যায়। একটু ধৈর্য্য ধরে পদ্ধতি গুলো অনুসরণ করলে বাড়িতে সহজেই এ পিঠা বানানো যায়। পিঠাটি তৈরিতে যা যা লাগবে -

উপকরণঃ

মাশরুমের জন্যঃ
- ৮ টুকরা শুকনো মাশরুম
- ১/২ চা চামচ লবণ
- ১/২ চা চামচ চিনি

আঠালো চালের জন্যঃ
- ১.২ কেজি আঠালো চাল
- ২ চা চামচ লবণ
- ২ চা চামচ চিনি
- ২ চা চামচ পাতলা সয়াসস
- ১ টেবিল চামচ ভোজ্য তেল

মুগ ডালের জন্যঃ
- ৬০০ গ্রাম মুগ ডাল
- ১ টেবিল চামচ লবণ
- ২ চা চামচ চিনি
- ১ টেবিল চামচ ভোজ্য তেল

অন্যান্যঃ
- অর্ধেক করে কাটা লবণাক্ত ডিমের কুসুম,
- অর্ধেক করে কাটা ১০টি কাজুবাদাম
- ২০ গ্রাম শুকনো চিংড়ি
- ৬০ টুকরো বাঁশ পাতা।

প্রস্তুকরণ প্রণালী

১ঃ মাশরুম ভিজিয়ে রাখুন।
২ঃ আঠালো চাল সারারাত বা কমপক্ষে চার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।
৩ঃ মুগ ডাল কমপক্ষে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।
৪ঃ অতঃপর আঠালো চাল, মুগ ডাল এবং শুকনো চিংড়ি সুগন্ধি না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন।
৫ঃ কাজুবাদাম ভিজিয়ে নিন। পরিষ্কার করুন। অতঃপর হালকা রোস্ট করুন।
৬ঃ আধকাটা ডিমের কুসুম কেটে নিন।

সমন্বয় (ত্রিভুজ আকৃতির জন্য)

একটি সরু আকৃতির কোণ তৈরির জন্য প্রশান্ত বাঁশের পাতা ব্যবহার করুন। প্রথমে কোণের ভেতর অল্প পরিমাণে আঠালো চাল দিন। তারপর এক টেবিল চামচ পূর দিয়ে মাঝখানে রাখুন। অতঃপর চাল দিয়ে বাকি জায়গা পূর্ণ করুন। পাতার দুদিক ভাঁজ করুন। তারপর আবার পাতার উপরের অংশটি ভাঁজ করে চাল পুরোপুরি ডেকে দিন। বাকী পাতাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দিন। শেষে সুঁতো দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে নিন।

রান্না

একটি পাত্রে যোং যি গুলোকে রাখুন। জল দিয়ে পাত্রটি পূর্ণ করুন। উপরে একটি ভারী পেট রাখুন। জল ফোটাতে থাকুন এবং আধা ঘণ্টা ধরে অল্প আঁচে রাখুন। মাঝেমধ্যে জলের স্তর দেখে নিন যাতে যোং যি সর্বদা পানির মধ্যেই থাকে। রান্না শেষে যোং যি তুলে নিন।

পরিবেশন

উষ্ণ এবং ঠান্ডা উভয়ই সমান সুস্বাদু। বাদাম বা মুগ ডালের যোং যি চাইলে মিষ্টি স্বাদের জন্য চিনি বা মধুতে ডুবিয়ে খেতে পারেন।

লেখক - আবু সাঈদ
শিক্ষার্থী, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অটোমেশন, ২য় বর্ষ
ছাংশা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ছাংশা, হুনান, চীন।

চীনের হাত ধরে চলছে সার্কের মধ্যে প্রথম কোনো দেশের নদী তলদেশে টানেল নির্মাণকাজ

কর্ণফুলী নদীর নেভাল একাডেমি থেকে আনোয়ারা প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সোয়া তিন কিলোমিটার। এখানেই নদীর তলদেশের ১৮ থেকে ৩১ মিটার গভীর দিয়ে চলবে সারি সারি গাড়ি। এ লক্ষ্যেই নির্মাণ করা হচ্ছে দেশ তথা সার্কের প্রথম টানেল সড়ক। ২০২২ সাল নাগাদ টানেল নির্মাণ শেষে গাড়ি চলাচল শুরু হবে।

যেভাবে শুরু

চট্টগ্রামে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি এসেছিল ২০০৮ সালে। চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রতিশ্রুতি দেন। কাজ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল এর পরপরই। তবে ২০১৬ সালের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলে হাসি ফোটে সবার মুখে। দূর হয় সব শঙ্কা; শুরু হয় নির্মাণকাজ।

সার্কে কর্ণফুলী টানেলই প্রথম

ভারতে সড়ক যোগাযোগে স্থলভাগে টানেল থাকলেও নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম। মুম্বাই থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত ৫০৮ কিলোমিটার হাইস্পিড রেল করিডর নির্মাণ করার পরিকল্পনা এরই মধ্যে চূড়ান্ত করেছে ভারত। এরই মধ্যে ২১ কিলোমিটার সাগরের নিচ দিয়ে টানেল থাকবে। জাপানের সহায়তায় কাজটি চলতি বছরের শেষ দিকে শুরু হয়ে শেষ হবে ২০২২ সালে। তবে এটিও রেল টানেল। সে হিসেবে বাংলাদেশই নদীর তলদেশে সড়ক টানেল নির্মাণে সার্কের মধ্যে প্রথম হতে যাচ্ছে।

নির্মাণে ব্যয় কত

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর নিচে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেল নির্মাণের জন্য চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কম্পানির (সিসিসিসি) সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে অনেক আগেই। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে আট হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা। এরই মধ্যে চীন অর্থায়ন করবে প্রায় চার হাজার ৮০০ কোটি টাকা। বাকি টাকা সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেবে।

কেমন হবে টানেল

নকশা অনুযায়ী দৈর্ঘ্য হবে তিন হাজার পাঁচ মিটার বা তিন কিলোমিটারের চেয়ে সামান্য বেশি। চট্টগ্রাম নগরীর নেভাল একাডেমি পয়েন্ট দিয়ে তলদেশে ঢুকে তা বেরোবে ওপারে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কম্পানি (কাফকো) এবং চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) মাঝামাঝি স্থান দিয়ে। নদীর তলদেশে এর গভীরতা হবে ১৮ থেকে ৩১ মিটার। মোট দুটি টিউব নির্মিত হবে। এর একটি দিয়ে গাড়ি শহরপ্রান্ত থেকে প্রবেশ করবে, আরেকটি টিউব দিয়ে ওপার থেকে শহরের দিকে আসবে। টানেলের প্রতিটি টিউব চওড়ায় হবে ১০ দশমিক ৮ মিটার বা ৩৫ ফুট এবং উচ্চতায় হবে ৪ দশমিক ৮ মিটার বা প্রায় ১৬ ফুট। একটি টিউবে বসানো হবে দুটি স্কেল। এর ওপর দিয়ে দুই লেনে গাড়ি চলাচল করবে। পাশে হবে একটি সার্ভিস টিউব। মাঝে ফাঁকা থাকবে ১১ মিটার। যেকোনো বড় যানবাহন দ্রুত স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারবে এই টানেল দিয়ে।

কী লাভ এই টানেলে?

টানেল নির্মাণের ফলে কর্ণফুলীর ওপার ঘিরে বিনিয়োগের নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হবে। এটিকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল হবে সেখানে। আর এশিয়ান হাইওয়ে ও নতুন সিল্ক রুটে প্রবেশ করবে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক করিডর।

টানেল নির্মাণকে কেন্দ্র করে কর্ণফুলী নদীর ওপারে বিনিয়োগ শুরু করেছে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো। বর্তমানে কর্ণফুলী নদীর ওপারে আংশিক চালু রয়েছে কোরিয়ান ইপিজেড। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। টানেল নির্মাণের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সরকার আনোয়ারায় একটি ইকোনমিক জোন স্থাপন করছে। তাছাড়া, চীনের বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ 'চায়না ইকোনমিক জোন' বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সড়ক যোগাযোগে নতুন দিগন্ত

টানেল নির্মাণ সমীক্ষায় বলা হয়েছে, কর্ণফুলী টানেলের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ চালু হবে। বর্তমানে এই রুটে চলাচলকারী গাড়িগুলো কর্ণফুলী সেতু ও কালুরঘাট সেতু দিয়ে চলাচল করছে। এতে প্রতি গাড়িকে গড়ে ২০ মিনিট বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। টানেল দিয়ে পার হলে এ সময়টুকু বাঁচবে। ঢাকা থেকে পণ্যবাহী গাড়ি সরাসরি কক্সবাজার যেতে সময় ও দূরত্ব দুটিই কমবে।

বছরে চলবে ৬৩ লাখ গাড়ি

চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কম্পানি (সিসিসিসি) এবং হংকংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অভি অরূপ অ্যান্ড পার্টনারস হংকং লিমিটেড যৌথভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদন জমা দেয় ২০১৩ সালের এপ্রিলে। এর ওপর ভিত্তি করেই চীন ও বাংলাদেশের যৌথ অর্থায়নে সিসিসিসি এখন টানেলের নির্মাণকাজ করছে। সেই সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা আছে, কর্ণফুলী টানেল চালুর প্রথম বছর ৬৩ লাখ গাড়ি টানেলের নিচ দিয়ে চলাচল করবে। একসময় এর পরিমাণ এক কোটি ৪০ লাখে গিয়ে ঠেকবে। চালুর প্রথম বছরে চলাচলকারী গাড়ির প্রায় ৫১ শতাংশ হবে কনটেইনার পরিবহনকারী ট্রেইলর ও বিভিন্ন ধরনের ট্রাক ও ভ্যান। বাকি ৪৯ শতাংশের মধ্যে ১৩ লাখ বাস ও মিনিবাস, আর ১২ লাখ কার, জিপ ও বিভিন্ন ছোট গাড়ি।

সূত্রঃ- কালের কণ্ঠ- ইফতে খাইরুল হক ইমন

সংবাদ-১

বাংলাদেশের করোনা মহামারী প্রতিরোধে চীনা চিকিৎসকদের অনলাইন কনফারেন্স

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বিশ্বের কাছে এখন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত চীন। তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হলেও বর্তমানে দেশটির করোনা পরিস্থিতি প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। এদিকে আমেরিকা, ইউরোপের দেশগুলোর পাশাপাশি এশিয়া মহাদেশেও প্রতিনিয়ত বাড়ছে করোনা আক্রমণের হার। এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে চীনা চিকিৎসকেরা। ৮ ই এপ্রিল বুধবার বাংলাদেশ সময় সোয়া একটায় বাংলাদেশি চিকিৎসকদের অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সিং-র মাধ্যমে পরামর্শ ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন দেন চীনের সংক্রমিত রোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চাং উন হোং। এসময় বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ, বাংলাদেশ এম্ব্যাসি চীনের রাষ্ট্রদূত লি-চিমিং, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপনসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ চাং উন হোং বাংলাদেশি ডাক্তারদের নানাবিধ পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে, যথাযথ ব্যবস্হা গ্রহণের পরামর্শ দেন। মহামারী পরিস্থিতি ঠেকাতে শুধু আক্রান্ত ব্যক্তিদেরই নয়, সন্দেহজনক ব্যক্তিদেরও পরীক্ষার আওতায় আনাসহ আরও বেশ কিছু পরামর্শ দেন। সামাজিক মিশ্রণ ও সংক্রমণ ঠেকাতে জনসাধারণের বাইরে চলাচল বন্ধ, বাড়িতে অবস্থান, জরুরি প্রয়োজনে বের হওয়া ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক মাস্ক পরা, আক্রান্তদের কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন তিনি। করোনায় মৃত্যু হার হ্রাসে চিকিৎসার আওতায় আনা, তাদের কাছ থেকে অন্যদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বন্ধ করা, চিকিৎসায় ভেন্টিলেটর, আইসিইউ সরঞ্জামাদি ব্যবহার, প্রয়োজনে অক্সিজেন সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন চীনা এই বিশেষজ্ঞ। রাষ্ট্রদূত লি চিমিং বলেন, করোনার বিরুদ্ধে জয়ী হতে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের পাশে থাকবে চীন। এ দুর্দিনে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একে অপরের পাশে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এদিকে গত বুধবার (৪ এপ্রিল) কোভিড-১৯ নিয়ে চীনা বিদেশী কাউন্সিলর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং-ইয়ি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনকে জানান, "করোনা মোকাবিলায় চীন বাংলাদেশকে আরো সাহায্য করতে পস্তুত।"

প্রতিবেদক
ইফতে খাইরুল হক ইমন
হুনান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, হুনান, চীন

সংবাদ-২

চীন থেকে দেশে পিপিই পাঠালেন বাংলাদেশি চিকিৎসক

বেইজিংয়ের ফুওয়াই হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক মিসবাউল ফেরদৌস ১০০ টি সুরক্ষা স্যুট, ১০০টি চশমা, ৪৫০টি ফেস-শিল্ড, চার হাজার সার্জিক্যাল মাস্ক ও ৬০০ এন-৯৪ (কোরিয়া) মাস্ক আগামী ২৯ মার্চে বাংলাদেশে পাঠান। করোনার চিকিৎসার প্রথম সারির তিনটি সংগঠন ছাড়াও ফুওয়াই হাসপাতালের অধ্যাপক ইয়োংচিয়েন উ **(Yongjian Wu)**, চীনা কার্ডিওলজি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক চুনবো গ্য (Junbo Ge) ও সহ-সভাপতি অধ্যাপক ইয়ং হুও (YongHuo) এবং কার্ডিওলজি এশিয়ান সোসাইটির কর্মকর্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জরুরি মেডিকেল সামগ্রীগুলো ঢাকায় পাঠানো হয়। তিনি বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরুতে বড় বড় হাসপাতাল যেমন, বারডেম, ঢামেক ও বিএসএমএমইউতে এগুলো বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ঝুঁকিতে থাকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও এয়ারপোর্টের কর্মকর্তাদের বিতরণ করা হবে। বাংলাদেশ থেকে একদল তরুণ চিকিৎসক তার সাথে যোগাযোগ করেছেন। ওই চিকিৎসকদের মাধ্যমেই মেডিকেল সরঞ্জামগুলো বিতরণ করা হবে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে মিসবাউল বলেন, বাংলাদেশের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পেলে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ভূমিকা রাখবেন।

প্রতিবেদক- সাব্বির আহম্মদ
বেইজিং ইনস্টিটিউট ইভ গ্রাফিক্স কমিউনিকেশন, বেইজিং, চীন

সংবাদ-৩

বিদেশী নাগরিকদের চীনে প্রবেশের উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China

Home The Ministry Policies and Activities Press and Media Service Countries and Regions About China Resources

Home > MFA News

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China National Immigration Administration Announcement on the Temporary Suspension of Entry by Foreign Nationals Holding Valid Chinese Visas or Residence Permits

March 26, 2020

নিউজ ডেস্কঃ বিশ্বজুয়ে কোভিড-১৯ এর দ্রুত প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে, চীন বিদেশি নাগরিকদের অস্থায়ীভাবে চীনে প্রবেশ স্থগিত করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছে, যা ২৮ শে মার্চ রাত ১২টা থেকে কার্যকর হবে। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, কূটনৈতিক, পরিসেবা, সি ভিসা এই কার্যাদেশের এর বাহিরে থাকবে।

অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত ও জরুরি মানবিক প্রয়োজনে বিদেশী নাগরিকরা চীনা দূতাবাস বা কনসুলেটে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারে। এই ঘোষণার পরে জারি করা ভিসা বিদেশী নাগরিকদের প্রবেশ প্রভাবিত করবে না। স্থগিতাদেশ একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা যা অন্যান্য দেশের প্রাদুর্ভাব পরিস্থিতি এবং মহামারি নিয়ন্ত্রণের আলোকে চীন এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। চীন সব দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে কর্মীদের আদান-প্রদান সঠিকভাবে পরিচালনা করবে।

সংবাদ-৪

বাংলাদেশ দূতাবাস চীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস -২০২০ পালিত

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্ম দিবসের সম্মানে এই বছরকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় চীনেও পালিত হলো দিবসটি। দিবসটি পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার চেতনায় উজ্জীবিত হলো বাঙালী। শোষণহীন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সংগ্রামকে বুকে ধারণ করে আমাদেরকে দেশের উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন চীনের বেইজিং এ অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মাহবুবুজ্জামান। বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যেগে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মান্যবর রাষ্ট্রদূত মাহবুবুজ্জামান দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির সূচনা করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

দূতাবাসের দোয়েল হলে অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ এর মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত মাহবুবুজ্জামান। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কোভিড-১৯ আক্রান্ত সমগ্র চীনে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে চীনা সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত পরিসরে মুজিব শতবর্ষের এই আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিববর্ষের এই ঐতিহাসিক ক্ষণকে সামনে রেখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণীসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের উপ-প্রধান এবং প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

এই দিবসকে উপলক্ষ্য করে দূতাবাস একটি বয়সভিত্তিক অনলাইন চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠান শেষে মান্যবর রাষ্ট্রদূত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মধ্যে রাষ্ট্রদূত "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ"-এর উপর সংকলিত একটি গ্রন্থ এবং কবিতা ও রচনাবলী এর একাধিক সংকলন বিতরণ করেন।

প্রতিবেদক- সাব্বির আহম্মদ
বেইজিং ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক্স কমিউনিকেশন, বেইজিং, চীন

সংবাদ-৫

করোনাভাইরাস: চীনে নিয়ম ভঙ্গের কারণে চার বিদেশি ছাত্রের শাস্তি প্রদান

নির্ধারিত নিয়ম ভঙ্গের কারণে শাস্তি নিশ্চিত করল চীনের নানচিং বিশ্ববিদ্যালয় অব অ্যারোনটিকস এন্ড অ্যাস্ট্রোনটিকস। সম্প্রতি চীনের এপিডেমিক করোনা ভাইরাস নিউমোনিয়া এর প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ভঙ্গের কারণে চার জন বিদেশী ছাত্রকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

চারজন বিদেশী ছাত্রের মধ্যে একজন ইকুয়েডরিয়ান, একজন পাকিস্তানি, একজন ব্রাজিলিয়ান এবং একজন রাশিয়ান রয়েছে। উলেখ্য যে, নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণাকরে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত নির্ধারিত সময়ের আগে কোন ছাত্রছাত্রী চীনে তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।

শাস্তিস্বরূপ সকলকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের ২০২০ সালের সকল স্কলারশিপ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দুই জনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং একজনের স্কলারশিপের আর্থিক অনুদান একমাস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ঠিক চীনের কোথায় তারা এসে উঠেছিলেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ এ উলেখ করা না হলেও চীনের জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া উইচ্যাট থেকে জানা যায় এই চারজনের ভিতর কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত কারনে চীনে ফিরে এসেছে, কেউ আবার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এসেছিল। অনেকে মনে করেন এই শাস্তি পরবর্তীতে যারা চীনের আইন অমান্য করবে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

প্রতিবেদক - আরিফুল হক
খুনমিং মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুনমিং, ইউন্নান, চীন

সংবাদ-৬

দেশে এসে বিরূপ পরিস্থিতির শিকার চীন ফেরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা

নভেল করোনাভাইরাসের প্রভাবে জানুয়ারি থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে চীন সরকার। করোনার প্রকোপ দিনদিন বৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ ঘোষণা করার কারণে চীনে অধ্যয়নরত কয়েক হাজার বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফিরে আসে। এসব শিক্ষার্থী নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ঘরের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, "এলাকার মসজিদ বা বাজারে গেলে লোকজন একটু ভিন্ন চোখে তাকায়, পাশাপাশি কিছু হয়তো বলতে চায় আমায়। কেউ কেউ হাসিঠাট্টা করে, যা আমাকে ব্যথিত করে। সবার ভেতর এমন একটি ধারণা যেন চীন থেকে আসা মানেই করোনায় আক্রান্ত রোগী"।

চীনের হনান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একজন জানান, 'দেশে আসতে চাচ্ছিলাম না। শেষমেষ বাবা-মায়ের বিশেষ অনুরোধে ২৬ জানুয়ারি দেশে পৌঁছাই। বাসা ঢাকার বাইরে হওয়াতে এক রাত কাটাতে হইছিলো ঢাকাস্হ বন্ধুর বাসায়। ঢাকাতে নিকটাত্মীয় থাকা স্বত্বেও, হয়তো করোনা ভয়ে আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করেননি তারা।

বাড়িতে এসে নিজেকে প্রায় ২০ দিন পৃথক করে রাখি। ২১ দিনের মাথায় হঠাৎ বাইরে বের হয়ে শুনি, আমাকে নিয়ে বেশ কয়েকজন বিভিন্ন কথা বলছে। অনেকের ভাষ্য, আমার চোখের দিকে তাকালে নাকি করোনায় আক্রান্ত হওয়া নিশ্চিত। স্কুলজীবনের কোনো এক বন্ধুর বাবা তাকে বার বার আমার সাথে দেখা করতে নিষেধ করছিলো। কেউ কেউ বলছিলো, চীনে গুলি করে মানুষগুলো মেরে ফেলছে বিধায় দেশে চলে এসেছি। অবশ্য, ক্লাস-অ্যাসাইনমেন্ট থাকার কারণে বাসার বাইরে বের হইনা তেমন একটা আর।' রাকিবুল নামের ছোং ছিং পোস্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন শিক্ষার্থী বলেন, আমি ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে বাংলাদেশে আসি। একমাস পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বেশ কয়েকদিন হলো, বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ক্লাস শুরু করেছে। মফস্বলে থাকায় একটুআধটু ইন্টারনেট সমস্যায় ভোগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই ভাবলাম রাজশাহী শহরে একটি সুবিধামতো মেস দেখে উঠে পড়বো। কারণ মেসে ব্রডব্যান্ডের ব্যবস্থা থাকে, যাতে করে আমার ক্লাস করতে সুবিধা হয়। যাই হোক, রাজশাহীতে এসে একটি মেস নিলাম। মেসের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রুমে গেলাম রাত ৮ টায়। এদিকে, রাত ৯:৩০ এর দিকে মেসের অন্যান্য সদস্যরা হঠাৎ মিটিং ডাকলো। তাদের মিটিং এর মূল বিষয়বস্তু ছিলাম আমি।

আমাকে নিয়ে তাদের মনে অনেক আতঙ্ক। কেউ কেউ বলছে, 'আপনি এই মেসে উঠবেন সেটা আমাদের অনেকেরই জানা ছিলনা। আমি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ভয়ের কোনো কারণ নেই; ইতিমধ্যে আমি ৩০ দিন পার করে ফেলেছি দেশে। কিন্তু তারা আমার কোনো কথা শুনতে নারাজ। তাদের একটাই বুলি, আপনি জানুয়ারির ১ তারিখে বাংলাদেশে আসেন বা তার আগে আসেন- সেটা দেখার বিষয় না। আপনি চীন থেকে এসেছেন এটিই বড় সমস্যার বিষয়। অনেক কিছুর পরে শেষমেশ তারা আমাকে মেস ছাড়তে বাধ্য করে।'চীনফেরত আরেকজন শিক্ষার্থী জানান, ঢাকাতে ভাইয়ের ভাড়া বাসায় উঠাতে, বাড়ির মালিক অসৌজন্যমূলক আচরণের পাশাপাশি তাদেরকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করেন।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকেই চীনে শীতকালীন বন্ধ শুরু হয়েছে। আর এ বন্ধ উপলক্ষে আগেই অনেকে দেশে এসেছিলেন। শোনা যাচ্ছে, শীতকালীন ছুটিতে আসা শিক্ষার্থীদেরও নানা রকম কটূক্তি শুনতে হচ্ছে।

তবে, **Bangladesh-China Youth Students Association (BCYSA)**-এর বরাত দিয়ে সংগঠনটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ বশীর উদ্দীন খান জানান, এমন অভিজ্ঞতা অহরহ শোনা যাচ্ছে এমনটি নয়। তবে আমাদের সবার কোভিড-১৯ নিয়ে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে। সাধারণ মানুষের জানার ঘাটতি থেকে এ ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে। সম্প্রতি চীন থেকে দেশে ফিরে যাওয়া সবাইকে নিজ উদ্যোগেই ১৪ দিন আলাদা থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে এগিয়ে এসে জননিরাপত্তামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ আরও কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন। চীনফেরত ব্যক্তি মাত্রই করোনা ভাইরাসের বাহক এমনটি ভাবা উচিত নয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে তীব্র জ্বর, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলাব্যথা ও তীব্র অবসাদ। কারও জ্বর হয়েছে মানেই সে করোনায় আক্রান্ত নয়। আবার, শুধু সর্দিতে আক্রান্ত কাউকে করোনায় আক্রান্ত ভাবা ভুল। কেউ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বলে সন্দেহ হলে তার কাছ থেকে কমপক্ষে ৩ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি ১৪ থেকে সর্বোচ্চ ১৭ দিনের মধ্যে এ ভাইরাসে সংক্রমিত না হলে তিনি আপাতত কোভিড-১৯ আক্রান্ত নন বলে ধরে নেওয়া হয়।

প্রতিবেদক
ইফতে খাইরুল হক ইমন, হেনান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
তানভীরুল ইসলাম, বেইজিং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়
রাকিবুল, ছোংছিং পোস্ট এন্ড টেলিকমিউনিকেশন বিশ্ববিদ্যালয়

সংবাদ-৭

চীনে বাংলাদেশি ছাত্রের মাস্ক বিতরণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্ক বিতরণ মুহূর্ত, ইনসেটে বাংলাদেশি ছাত্র

চিয়াংসি ইউনিভার্সিটি অব ফাইনান্স এন্ড ইকোনমিক্সে নিজ অর্থায়নে সার্জিকাল মাস্ক বিতরণ করলেন বাংলাদেশি ছাত্র মোহাম্মদ মাহমুদুল হাছান অনিক। মাহমুদুল হাছান অনিক চিয়াংসি ইউনিভার্সিটি অফ ফাইনান্স এন্ড ইকোনমিক্সে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইকনোমিক্স বিভাগে ৩য় বষের চায়নিজ মিডিয়ামে পড়াশুনা করছেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারি রবিবার বিকালে চিয়াংসি ইউনির্ভাসিটি অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনোমিক্স বিশ্ববিদ্যালয় এর ইন্টারন্যাশনাল ডরমিটরির লবিতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

মোহাম্মদ মাহমুদুল হাছান অনিক বলেন, করোনা ভাইরাসের এই মহামারি সময়ে চীনে সার্জিকাল মাস্ক ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ালে আমার চীনা বন্ধুরা যখন আমাকে চীনের পরিস্থিতি জানাল তখন খুবই খারাপ লাগছিল। চীনে আমার দীর্ঘকালেরজীবনে চীন আমার দ্বিতীয় ঘরের মতোই মনে হয়। তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০০সহ বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় ১১০০০ মাস্ক ডোনেশন করি। এর ফলে চীনের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য দেশের ছাত্রদের মাঝে বাংলাদেশের সুনাম করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। যারা আমাকে সহযোগিতাকরেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিবেদক - সাব্বির আহম্মদ
বেইজিং ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক্স কমিউনিকেশন

সংবাদ-৮

চীনে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে চীনা রাষ্ট্রদূতের চিঠি

ছবিঃ চীনা রাষ্ট্রদূতের স্বাক্ষরিত মূল চিঠি

গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারি, রোববার বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি-চিমিং চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এক বার্তা পাঠান। তিনি তার চিঠিতে বলেন “শীত মৌসুমের শুরুতে হঠাৎ করে এই করোনভাইরাস **(COVID-19)** মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে এই ইস্যুটি সকল বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের পরিবারের মাঝে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষত যখন বিদেশের মাটিতে নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হয়েথাকতে হয়। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীদের পরিবার-পরিজন, স্বদেশের ১৭ কোটি মানুষের ও চায়না এম্ব্যাসির শুভ কামনা রয়েছে। এই ভাইরাসটি হয়তো আমাদের পারিপার্শ্বিকভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু আমাদের পারস্পারিক যোগাযোগ, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং ভালোবাসাকে আবদ্ধকরার শক্তি এই ভাইরাসের নেই। আমরা সবাই মিলেই পারবো এই ভাইরাস মোকাবি-লা করে জয়ী হতে।

যখন এই মহামারী পরিস্থিতিতে সবাই বাংলাদেশে ফেরার মনস্তাত্তিকতা প্রদর্শন করে এবং সুযোগ থাকা স্বত্ত্বেও দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা ও চীন সরকারের প্রতি বিশ্বাস রেখে চীনে অবস্থান করার সিদ্ধান্তনেয়, সেটা অবশ্যই একটা বড় ত্যাগ এবং চায়না এম্ব্যাসি, বাংলাদেশ সেইসব শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে। পাশাপাশি এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাংলাদেশকে ঝুঁকি মুক্ত করে বলেও তিনি মত পোষণ করেন।

চিঠির শেষে তিনি আরো উলেখ করেন যে “চায়না এম্ব্যাসি, বাংলাদেশ সবসময় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে পাশে থাকবে। চীনা সরকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ বহাল রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি জানান। চীনে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের চীনা সরকারের প্রতি আস্থা রেখে দৃঢ় হওয়ার পরামর্শ দেন মাননীয় রাষ্ট্রদূত। “শীত বিদায় নিবে, বসন্ত অবশ্যই আসবে” বলে তিনি তার চিঠির সমাপ্তি করেন।

প্রতিবেদক - আব্দুল কাদের (কাংদান)
শেনইয়াং অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি, লিয়াওনিং, চীন

সংবাদ-৯

করোনা মোকাবিলায় চীনকে চিকিৎসা সামগ্রী দিল বাংলাদেশ

করোনা মোকাবিলায় চীনকে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সামগ্রী দিয়েছে বাংলাদেশ। এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে- হ্যান্ড গাভস, ফেস মাস্ক, মাথার ক্যাপ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সু কভার এবং গাউন।
গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূতের কাছে এসব উপকরণ তুলে দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।
চিকিৎসা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে- ১০ লাখ হ্যান্ড গ্লাভস, ৫ লাখ ফেস মাস্ক, দেড় লাখ মাথার ক্যাপ, হ্যান্ড সেনিটাইজার ১ লাখ, সু-কাভার ৫০ হাজার এবং ৮ হাজার গাউন।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, চীন সরকার তথা চীনা জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বন্ধুত্বের জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এসব সামগ্রী পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এখন যেসব সামগ্রী তুলে দিচ্ছি; তার সবগুলোই বাংলাদেশে তৈরি। চিকিৎসা সামগ্রীর জন্য বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চীনা রাষ্ট্রদূত লি চিমিং বলেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, তাঁর উদারতার জন্য আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এটা ঠিক যে, আমরা সাময়িক দুরাবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তবে যৌথ উদ্যোগে এর বিস্তৃতি আমরা ঠেকাতে পারবো।

প্রতিবেদক
ইফতে খাইরুল হক ইমন
হনান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, হনান, চীন

সংবাদ-১০

করোনা মোকাবিলায় চীনের নেয়া পদক্ষেপসমূহ থেকে আমাদের শিক্ষা

চীনের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ ভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্বে চীন যেভাবে সমালোচিত হয়েছিল আবার স্বল্প সময়ে তা নিয়ন্ত্রণে চীন সারা বিশ্বকে চমকেও দিয়েছে। আজ ইউরোপ বা আমেরিকার বেশ কিছু উন্নত দেশগুলো যেখানে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে চীন সরকার ও জনগণের নেওয়া পদক্ষেপগুলো অত্যন্ড় প্রশংসনীয়। চলুন জেনে আসি চীনের নেওয়া পদক্ষেপসমুহ-
দেখুন, তারা প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাট, পার্ক ও শপিং-মলগুলোতে জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটিয়েছে। পাশাপাশি, অ্যাপার্টমেন্টগুলোতেও ছিল একই ব্যবস্হা। ১৪ দিনের মধ্যে বিশাল দু'দুটো অস্হায়ী হাসপাতাল তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো পুরো বিশ্বে। একই সাথে বিভিন্ন ইনডোর এবং আউটডোর স্টেডিয়াম রূপান্তরিত করে ফেলে বিশাল কোয়ারেন্টিন সেন্টারে।

প্রেসিডেন্ট শি-জচিনপিং ভাইরাসটি মোকাবিলায় দেশটির প্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজে নেমে পড়ে। শুরু হয় রোবট, ড্রোনসহ বিভিন্ন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্বলিত প্রযুক্তির ব্যবহার।

বিশেষ করে হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় খাবার ও ঔষধ-পাতি সরবরাহে রোবটের ব্যবহার বেশ লক্ষ্যণীয় ছিল। তাছাড়া, তাপমাত্রা শনাক্ত-করণ ও পরবর্তী নির্দেশনা দেয়া, রাস্তা-ঘাট ও ট্রেন-স্টেশন জীবানুমুক্তকরণে রোবট কাজ করে যাচ্ছিলো। বিভিন্ন হাসপাতালে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ছড়িয়ে জীবাণু নাশক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছিলো রোবট।

ছবি- রোবটের ব্যবহার

ড্রোন ব্যবহারে পটু চাইনিজরা এর ব্যবহার দেখিয়েছে সর্বসাধারণের ভেতরে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে। পাশাপাশি জীবাণুমুক্তকরণ ওষুধ ছিটানো, কুইক তাপমাত্রা স্ক্রিনিং, গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার উপরে কড়া নজরদারি ও এদের বাইরে বের না হওয়ার জন্য নানাবিধ সতর্কীকরণে ড্রোনের ব্যবহার হচ্ছিলো। তাছাড়া, এর সাহায্যে অতি দ্রুত বিভিন্ন নোটিশ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো সর্বসাধারণের মাঝে।

নিজেদের মধ্যে সংক্রমণ রোধে হাসপাতাল কর্মীরা প্রতিমুহূর্তে ভিডিও কনফারেন্সিং-র মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা দিতে শুরু করে। এছাড়াও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে রোগটি শনাক্তকরণ ও পরিসি্হতি মোকাবিলায় দক্ষতা দেখিয়েছেন চীনারা। ফেসিয়াল রিকগনিশন সংবলিত অসংখ্য ক্যামেরা শরীরের তাপমাত্রা শনাক্তকরণ ও মানুষের গতিবিধি নির্ণয়, কেউ মাস্ক পরে আছে কিনা তা শনাক্তকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। অসংখ্য ভিডিওচিত্রে দেখা যায়, হোভারবোর্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন পার্ক কিংবা কমিউনিটির অভ্যন্তরে অতিদ্রুত জীবানুনাশক ছড়াচ্ছে কর্মীরা।

এছাড়াও বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রায় প্রতিটি শহরের আনাচে-কানাচে জীবাণুনাশক ছিটাতে সহায়তা করে। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বহুতল ভবনকে সিলগালা করে দেয়। যেসব কমিউনিটিতে দু'একজন রোগী পাওয়া যাচ্ছিলো সেসব কমিউনিটি অতিদ্রুততার সাথে সিল করার ব্যবস্হা করা হয়। পাশাপাশি এসব কমিউনিটিতে বসবাসরত বাসিন্দাদের মধ্যে খাবার সরবরাহের কাজ খোদ সরকারই হাতে নেয়।

চীনা সরকার স্পেশাল সোয়াট পুলিশ টিম গঠন করছিলো যারা, নিয়মভঙ্গ করে অবাধ চলাফেরা করা আক্রান্ত রোগীদের সনাক্ত করে হসপিটালাইজ করতেন। বিভিন্ন গুজব যাতে দ্রুত না ছড়িয়ে পড়তে পারে, সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন এক্সপার্ট টিমকে দেয়া হয় সোশ্যাল মিডিয়ার উপরে কড়া নজরদারির কাজ। জনপ্রিয় ওয়েবসাইট- আলিপে, উইচ্যাট বিভিন্ন সার্ভে চালু করে জনগণকে প্রতি মুহূর্তে নানাবিধ সতর্কীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

তাছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত ব্যক্তির সর্বশেষ অবসহান প্রকাশ করার পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তির ভ্রমণকৃত সহানের রেকর্ড প্রচার করতেন, যাতে করে অন্য যেকোনো ব্যক্তি ওইসব এলাকা এড়িয়ে চলতে পারে। চীনাদের কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থা একটি অ্যাপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হতো। প্রত্যেকের জন্য একেকটি ইউনিক কিউ-আর কোড তাদের ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্যাটাস দেখাতো।

যেমন ধরুন, যদি আপনি সংক্রমণ থেকে নিরাপদ হন, তবে সবুজ আলো দেখাবে। লাল আলো তখনি দেখাবে, যখন কেউ কোয়ারেন্টিনে। ধরুন, অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি ঘরের বাইরে নামলেন এবং আপনার ফোনের কিউআর কোডটি লালচে হয়ে জ্বলে উঠছে; আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে কোয়ারেন্টিনে যেতে হবে, অন্যথায় জেল কিংবা জরিমানা। কোয়ারেন্টিনে থাকা হাজারো লোকজনের ডিপ্রেশন কাটাতে নিয়মিত বিভিন্ন এক্সারসাইজ এবং এন্টারটেইনের ব্যবস্থা চালু রাখা হয়।

ড্যান্সিং রোবট ছিল কোয়ারেন্টিনে থাকা রোগীদের এন্টারটেইনের অন্যতম মাধ্যম। চায়নিজ অথোরিটি শহরের বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক হেভি কেমিকেল স্প্রেয়িং মেশিন স্হাপন করে, যাতে করে বাইরে থাকা যে কেউ তৎক্ষনাৎ নিজেকে জীবাণুমুক্ত করতে পারে। বিল্ডিং-র লিফটগুলোর বোতাম টিপতে ইনস্ট্যান্ট গ্লাভস বা কাঠি ব্যবহার দেখা যায়। ব্যাংক কর্মকর্তাগন প্রতিটি ব্যাংকে থাকা নোটগুলো জীবাণুনাশক করতে নিজেরা উদ্যেগ নেয়। সচেতন চায়নিজদের মাস্ক নিতে জনগনের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে।
প্রতিটি প্রদেশ সরকার রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ফ্রি মাস্ক সরবরাহের ব্যবস্থা শুরু করে। তাছাড়া চায়নিজ সরকার মাস্ক ভেন্ডিং মেশিন চালু করে, যেখান থেকে অতি সহজেই অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে মাস্ক ক্রয় করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। সঠিকভাবে মাস্ক পরা এবং এর যথাযথ ব্যবহারে লোকজন পুরোপুরি সতর্ক ছিল। মজার ব্যপার হচ্ছে, তারা পোষা কুকুর-বেড়ালকেও মাস্ক পরিয়ে রাখতো। চীন লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের অবস্থান রেকর্ড করার জন্য বেশ কয়েকটি অ্যাপস চালু করে। কিছু শহর তাদের নিজস্ব অ্যাপস তৈরি করেছিল।

ট্রেন বা প্লেন থেকে নামার আগে তাদের নাম, ফোন নম্বর এবং ভ্রমণ ইতিহাস স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ করার লক্ষ্যেই এর চালু হয়। বিদেশি শিক্ষার্থীদের নেয়া হচ্ছিলো আলাদা যত্ন। ২৪ ঘন্টা মনিটরিং, বাইরে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এবং প্রত্যহ ৩/৪ বার তাপমাত্রা রেকর্ড করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের কাছে রিপোর্ট করার ব্যবস্হা চালু হয়।
চাইনিজ সরকার বিনামূল্যে সকল বিদেশী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা করার ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের মাঝে ফ্রি খাবার সরবরাহের আদেশ দেয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুধুমাত্র অতীব প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বের হতে পারছিলো শিক্ষার্থীরা। বাকি সময় প্রধান গেইটে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিস্টেম অটোমেটিক লক করা থাকতো। পাশাপাশি নিয়মভঙ্গের কারণে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কিছু-কিছু শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ বাতিল পর্যন্ত করেছিলো।

এহেন মারাত্মক পরিস্থিতিতেও থেমে থাকেনি চীনাদের শিক্ষা-কার্যক্রম। শীতকালীন ছুটিতে বন্ধ হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো হঠাৎ করে অনলাইনে ক্লাস নেয়ার ঘোষণা দেয়। চীনে এই প্রথম ভিডিও কনফারেন্সিং-র মাধ্যমে একসাথে এতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাঠদান শুরু করে।

ছবি-ফেসিয়াল রিকগনিশন

ছবি- মাস্ক ভেন্ডিং মেশিন

অসংখ্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের মাঝে সেমিস্টার লসের শঙ্কা কাজ করছিল, বিধায় হঠাৎই অনলাইন ভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচির ঘোষণায় স্বস্তি ফিরে আসে তাদের মাঝে। শিক্ষাকার্যক্রম চলার পাশাপাশি চলছিলো অফিশিয়াল কার্যক্রম। লক্ষাধিক চীনা কর্মী ঘরে বসে অনলাইনে কাজ করেছেন। উলেখ্য, ২৩ জানুয়ারির পর থেকে হুপেইয়ের রাজধানী উহানের প্রশাসন যখন কাউকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন, তখন প্রদেশের সরকারী কর্মকর্তারা আস্তে আস্তে বাসিন্দাদের বাড়ির ভিতরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিক বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয় (যদিও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান শীতের ছুটিতে বন্ধ ছিল)।

অ্যাপার্টমেন্টগুলো লোকজনকে একটি গেইট দিয়ে ভেতরে ঢোকাতো এবং প্রতিটি পরিবার প্রতি তিন দিনে একবার কেবল কেনাকাটার জন্য পরিবারের একজন সদস্যকে বাইরে পাঠাতে পারতো এবং প্রত্যেকের তাপমাত্রা প্রবেশ পথে পরীক্ষা করা হতো। কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় কর্মকর্তারা প্রায় ৬০ মিলিয়ন বাসিন্দাদের উপরে আরও কঠোর নীতি প্রয়োগ করে। শীঘ্রই হুপেই সরকার কমিউনিটি কর্মকর্তাদের আদেশ দিয়েছিল যে, সমস্ত আবাসিক কমপেক্সের চারিদিকে কঠোর নজরদারি প্রয়োগ করাসহ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, প্রত্যেকের শরীরের নিয়মিত তাপমাত্রা পরিমাপ, বাসিন্দাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়তে নিষেধ করা ইত্যাদি।

ছবি- অনলাইন পাঠদান কর্মসূচি

পাশাপাশি, কেউ যদি তাপমাত্রা পরীক্ষা বা কোয়ারেন্টিনের আদেশে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে, তবে তার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ঘোষণা আসে। স্থানীয় কর্মকর্তারা প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবদের যে কোনো সামাজিক সমাবেশে যোগ না দেওয়ার জন্য বার বার সতর্ক করে যাচ্ছিলেন। এই বিধি অমান্যকারী কোনো ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি এবং জরিমানা করা হতে পারে, এই মর্মে জানানো হয়। পাশাপাশি, গ্রামগুলোর প্রবেশপথ বন্ধে স্বেচ্ছাসেবকগণ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পরিবার-পরিজন ছেড়ে আসা হাজারো ডাক্তার ও নার্সগণ সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছিলেন আক্রান্ত ব্যক্তিদের।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে মানুষ কর্মক্ষেত্রে যোগদান করা শুরু করে। অফিসের প্রবেশপথে ছিল ৩/৪ স্তরের কড়া নিরাপত্তা। তাছাড়া প্রত্যেক কর্মী তার নিজস্ব জায়গা অন্য কর্মীদের থেকে স্বতন্ত্র রেখেই তবে কাজ করছিলেন। তাছাড়া নিয়মিত তাপমাত্রা পরিমাপ ছিল খুবই সাধারণ একটি বিষয়।

ইতিমধ্যে, সরকার অত্যাধুনিক স্ক্রিনিং হেলমেট সরবরাহ করে নিরাপত্তাকর্মীদের, যাতে করে অতি সহজেই সন্দেহভাজন রোগী শনাক্ত করে হসপিটালাইজ করা যায়। সদ্য বিদেশ থেকে আসা লোকদের পাসপোর্টে লেভেলিং এর ব্যবস্থা করা হয়। আস্তে আস্তে বিভিন্ন শহরে আক্রান্তের হার শূন্যের কোঠায় চলে আসে। রোগী না থাকায়, অধিকাংশ অস্থায়ী হাসপাতাল স্থায়ীভাবে বন্ধকরে দেয়া হয়।

সরকারের নেয়া ভিন্ন পদক্ষেপের সাথে জনগণের সহযোগিতায় আজ চীন প্রায় পঁচানব্বই শতাংশেরও বেশি ভাইরাসমুক্ত। যেখানে আমেরিকা, স্পেন ও ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হিমশিম খাচ্ছে। চীনাদের মহামারী পরিস্থিতি এত দ্রুত সামলে ওঠার মূলমন্ত্র হচ্ছে, সভ্য এক জাতির সৃষ্টি। তাছাড়া, ওদের কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কড়া এবং স্বচ্ছ যেটা বহু দেশই করতে পারেনি।

এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যমতে, করোনাভাইরাস ২১০টি দেশে ছড়িয়েছে। যার মধ্যে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে আক্রান্তের হার। সরকারি নির্দেশ সঠিকভাবে পালনের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে পর্যাপ্ত সচেতনতাই পারে করোনা মোকাবিলায় উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে, যা আমাদের দেশে খুবই দরকারি।

প্রতিবেদক- ইফতে খাইরুল হক ইমন
হনান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, হনান, চীন

নানচিং ইউনিভারসিটি অব আর্টসের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সুব্রত কুমারের করোনা সম্পর্কিত কিছু চিত্রকর্ম

HOPE

加油中国

HELP
BOX
The Real Hero

BCYSA এর নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড-২০২০-২১ ঘোষণা

বাংলাদেশ-চীন ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ২০২০-২১ সালের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির সভাপতি হিসেবে পুন:নির্বাচিত হয়েছেন পিএইচডি গবেষক জনাব এ.এ.এম মুজাহিদ, সাধারন সম্পাদক পদে ড. মুহম্মদ শাহানুল ইসলাম, সহ-সভাপতি পদে মোঃ বশির উদ্দিন খান, মারুফ হাসান, আগা মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন এবং যুগ্ম-সম্পাদক পদে তানভিরুল ইসলাম এবং নুজহাত ফারহানা নির্বাচিত হয়েছেন।

BCYSA NEWS এর প্রধান বার্তা সম্পাদক পদে জনাব মোহাম্মদ ছাইয়েদুল ইসলাম এবং নির্বাহী বার্তা সম্পাদক পদে ইফতে খাইরুল হক ইমন নির্বাচিত হয়েছেন।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন:- মোঃ রাইসুল হাসান রাসেল (অফিস সহকারি), মোঃ আন নাজমুস সাকিব খান (প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক), এ.বি.এম হাসান লিমন (অর্থ-সম্পাদক), মাহমুদুল হাসান (কার্যনির্বাহী সদস্য), মাহজাবিন তাবাসসুম (কার্যনির্বাহী সদস্য), মোঃ রিশাদ আহমেদ (কার্যনির্বাহী সদস্য), মোঃ আব্দুর রহমান রুবেল (কার্যনির্বাহী সদস্য), মোঃ আরিফুল হক (কার্যনির্বাহী সদস্য), গাজী তৌফিক এজাজ (উপ-বার্তা সম্পাদক) এবং সাব্বির আহমেদ (উপ-বার্তা সম্পাদক)।

নব নির্বাচিত সভাপতি জনাব এ.এ.এম মুজাহিদ বাংলাদেশ-চীন ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসে-াসিয়েশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং গত ২০১৯-২০ সালে প্রথমবারের মতো সাফল্যের সাথে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। উনি দায়িত্ব থাকাকালীন সময়ে এই অ্যাসোসিয়েশন করোনা মাহামারিতে চীনে এবং বাংলাদেশে নানাবিধ সহায়তায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন, চীনে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত রাখতে "মহাপ্রাচীর" নামে বাংলা ম্যাগাজিন এবং চীন প্রবাসী বাংলাদেশিদের অর্জিত সাফল্য, উচ্চ শিক্ষায় বৃত্তি, চীনে কিংবা বাংলাদেশে চাকুরির খবরাখবরসহ চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কিত সত্য ও গবেষণাধর্মী তথ্য প্রকাশের অঙ্গীকার নিয়ে BCYSA NEWS নামে অনলাইন নিউজ পোর্টাল চালু করেন।

জনাব মুজাহিদ বর্তমানে চীনের সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন বিভাগের পিএইচডি তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর হিসাবে কাজ করছেন। তিনি ২০২০ সালে সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "পাবলিক-স্প্রিটেড অ্যাওয়ার্ড" অর্জন করেন। তিনি ইন্সটিটিউট অব স্মার্ট সিটি, সাংহাই এর একজন গবেষক (২০১৭) এবং কম্পিউটার ভিশন গবেষকদলের টিম লিডার হিসাবে ২০১৮ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

নব নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক ড. এম শাহানুর ইসলাম চীনের তিয়ানজিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমুদ্রবিজ্ঞানে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ইঙ্গিঋঅ এর সদস্য থাকাকালীন বিগত ছয় মাসে তিনি ৫২ টি করোনা সংক্রান্ড় এবং শিক্ষামূলক খবর লিখে অর্জন করেন বিশেষ সম্মাননা। এছাড়াও তিনি করোনা অ্যালার্ট নামে একটি মোবাইল অ্যাপিকেশন তৈরি করেছেন। গবেষক হিসেবে তার ষোলটি সাইন্টিফিক পেপার এবং ২২ টি পোস্টার রয়েছে।

নব নির্বাচিত প্রধান বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ ছাইয়েদুল ইসলাম বর্তমানে চীনের চিয়াংশি ইউনিভার্সিটি অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিকস বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত আছেন। করোনাভাইরাস মহামারীর প্রাক্কালে চীনে বাংলাদেশি এবং মানবতার পক্ষে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রধান সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের নামকরা গণমাধ্যমের চীন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন। তার মধ্যে উলেখযোগ্য, বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন নিউজ পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল ডিবিসি নিউজ, ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং দৈনিক প্রথম আলোতে লেখালেখি করেন।

নব নির্বাচিত নির্বাহী বার্তা সম্পাদক জনাব ইমন চীনের হেনান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল এন্ড ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশল বিষয়ে অধ্যয়নরত। তিনি বিগত একবছর ধরে BCYSA- র নিউজ এডিটিং শাখায় যুক্ত আছেন। তাছাড়া, গত ছয়মাস ধরে নিউজ আপলোডিং এবং প্রুফরিডিং করে আসছেন তিনি। এছাড়াও, জনাব ইমন বিভিন্ন গবেষণাধর্মী আর্টিকেল লেখালেখির সাথে যুক্ত।

গতকাল (২ মে), শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ৯ ঘটিকায় নতুন এ কমিটির চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। নব নির্বাচিত বোর্ডটি ২০২০ সালের মে মাস থেকে পরিচালনা শুরু করে আগামী এক বছরের জন্য BCYSA কে নেতৃত্ব দিবে।

এদিকে, গত ২০ শে এপ্রিল BCYSA- র তৃতীয় কার্যনির্বাহী বোর্ড ২০২০-২১ এর অনলাইন আবেদন ফর্ম ছাড়া হয় এবং বিভিন্ন পদে মোট ৩৬টি আবেদন জমা পড়ে। এবারের প্রার্থী বাছাইয়ে এবং নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেন-

মোহাম্মদ সাহাবুল হক (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, BCYSA)
পিএইচডি প্রার্থী, বেইজিং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং, চীন।
সাবেক সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, ২০০৩-০৪ ।
সহযোগী অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

মোহাম্মদ তৌহিদ (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, BCYSA)
সিনিয়র জার্নালিস্ট, বিদেশী বিশেষজ্ঞ, চায়না-রেডিও ইন্টারন্যাশনাল, বেইজিং, চীন।

ডক্টর মুহম্মদ রাশেদুজ্জামান (উপদেষ্টা, BCYSA)
পোস্ট ডক্টরাল ফেলো, নর্থ চায়না ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, বেইজিং, চীন।
সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকা।

তিনজন নির্বাচকদের সর্বসম্মতিতে বিচার-বিশেষণের পর যোগ্যতাসাপেক্ষে ২০২০-২১ সালের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ-চীন স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি পিএচডি গবেষক জনাব এ. এ. এম মুজাহিদ নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "নব নির্বাচিত কমিটির প্রত্যেকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সংগঠনকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাবে বলে আশাকরি। BCYSA- র প্রতিটি সদস্য মিলে আমরা একটি পরিবার।

বাংলাদেশ-চীন স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন পূবের ন্যায় চীনে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে ব্যক্তিগত উন্নয়ন, প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের উন্নয়নের সহযোগী হিসাবে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবে"। তাছাড়া, সংগঠনের কল্যাণে সহমর্মিতার মানসিকতা নিয়ে কমিটি ও কমিটির বাইরে প্রতিটি সদস্যকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সংগঠনটির সম্পাদক ড. শাহানুল বলেন, "আমাকে সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত করায় নির্বাচন কমিশন কে ধন্যবাদ এবং আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামী এক বছরে সংগঠনকে আরও গতিশীল রেখে প্রকৃত চীন প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ রক্ষায় এবং দু'টো দেশের পারস্পরিক সুসম্পর্ক রক্ষায় কাজ করে যাবো"। নব নির্বাচিত কমিটি সংগঠনের কল্যাণমূলক কাজের ধারা ধরে রাখবে বলে আশাবাদী তিনি।

বার্তা সম্পাদক জনাব ছাইয়েদুল জানান, "বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৩য় কার্যনির্বাহী কমিটিতে আমাকে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বভার দেওয়া এবং আমার উপর আস্থা রাখায় নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই। সবার একাত্ম প্রচেষ্টায় আগামী দিনগুলোতে আমরা চীনে অস্থানরত ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে কাজ করে যাবো।

আমরা সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবো। চীনে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিদেরকে তথ্য, মেধা, পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করছি। চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব অটুট এবং দীর্ঘজীবি হউক"।

নির্বাহী বার্তা সম্পাদক ইফতে খাইরুল হক জনাব ইমন বলেন, "সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে যাবে BCYSA. সংগঠনের সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখতে তরুনদের এগিয়ে আসা দরকার"। এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের কলম চালনায় আরো বেশি সক্রিয় এবং পারদর্শী হওয়ার উপরে গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

উলেখ্য, ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত BCYSA চীনের বাংলাদেশী শিক্ষার্থী এবং পেশাদারদের একটি প্ল্যাটফর্ম। ২০১৬ সাল থেকে এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে এবং চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের স্বার্থে কল্যানমূলক কাজ করে যাচ্ছে সংগঠনটি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বর্তমান শিক্ষার্থী এবং চীনের বিভিন্ন খাতে কমরত বাংলাদেশী পেশাদাররা BCYSA-র সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্যতা পেয়ে থাকে। কমপক্ষে ৬ মাস চীনে পড়াশোনা করা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা এবং কমপক্ষে পুরো ১ বছর চীনে অতিবাহিত করা পেশাদাররাও BCYSA-র সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্য।

ফটোগ্রাফি

তুষারশুভ্র
পাওথুছুয়ান ক্যাম্পাস
শানতোং ইউনিভার্সিটি
রাফি উর রহমান

জ্যোৎস্না বিলাস
ছুয়ানছাং স্কয়ার
চিনান শহর
রাফি উর রহমান

Majestic City Chongqing
Razowan Ahmed

Majestic City Chongqing
Razowan Ahmed